শ্রেষ্ঠ উর্দুগল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

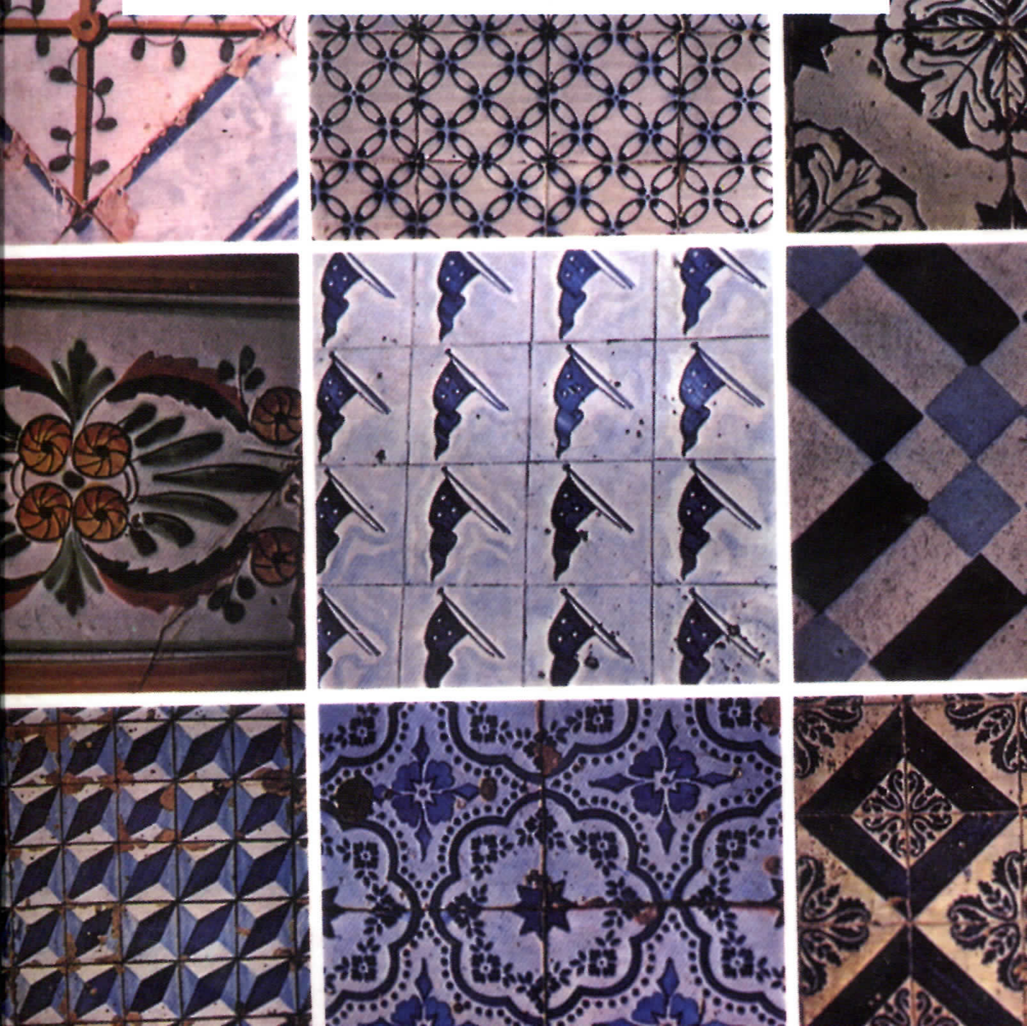

চি রা য় ত গ্র ন্থ মা লা

আলোকিত মানুষ চাই

শ্রেষ্ঠ উর্দু গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

শহিদুল আলম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১২৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0126-4

ভূমিকা

উর্দু একটি ইন্দো-আর্য ভাষা যার উৎপত্তি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে—দিল্লির আশপাশে। মোগল রাজত্বকালেই উর্দুকে একটি পৃথক সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে ১৯৪৭-এর দেশভাগের আগ পর্যন্ত উত্তর ভারতের কতিপয় অঞ্চলে উর্দু আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে হিন্দির পাশাপাশি ব্যবহৃত হত। বিভাগের পর উর্দুভাষী এক বিপুল জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমায়, থেকেও যায় কিছু ভারতে। ১৯৮০-তে প্রকাশিত *কলিয়ার'স এনসাইক্লোপেডিয়া*'র তথ্যানুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানে উর্দুভাষী জনসংখ্যা প্রায় তিন লাখের মতো। আর ভারতে রয়েছে প্রায় আড়াই লাখের কাছাকাছি। এই সংখ্যা নিশ্চিত এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাবি, বেলুচি, সিন্ধি, পশতু ইত্যাদি।

তাহলে বলা যায়, বাংলাসাহিত্য বলতে যেমন আমাদের মনে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের মিশ্র একটি চেহারা ভেসে ওঠে, উর্দু সাহিত্যের বেলায়ও ঠিক তাই। অর্থাৎ উর্দু ভাষায় শিল্পজ উৎকর্ষ ঘটেছে উভয় অঞ্চল—পাকিস্তান এবং উত্তর-ভারতে। যে কারণে এই ভাষার সাহিত্যে আমরা পাই উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় সীমারেখাকে উতরানো বিচিত্র স্থান-কাল-পাত্রের বিচিত্রতর সমাবেশ।

মোটামুটিভাবে উর্দু সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্ভব-পর্ব থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রধান লেখক হিসেবে যারা নিজেদের ভাষা-বৃত্ত ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন আমরা তাদেরকেই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। নির্বাচিত গল্পগুলোও সিংহভাগ ক্ষেত্রে যাতে লেখকদের প্রতিনিধিত্বকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা হয় সেদিকে সম্ভাব্য সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। ফলে এটিকে উর্দু কথাসাহিত্যের একটি প্রামাণ্য বাংলা অনুবাদ সংকলন বললে অত্যুক্তি হবে না। বিব্রতকর ঠেকলেও এ-কথা সত্যি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে যথার্থ অর্থে উর্দু-গদ্য সাহিত্যে কোনো কাজ হয়নি। এর প্রধান উৎকর্ষ ঘটে বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ, ইসলামি জাগরণ এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এই অনুভূতি ও বোধগুলোই এক পর্যায়ে উর্দু সাহিত্যের প্রগতিশীল আন্দোলনে রূপ নেয়। জনৈক উর্দু সাহিত্য-সমালোচকের তথ্যানুযায়ী 'এই আন্দোলন সোচ্চার হয়ে ওঠে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ যে বছর মুন্সী প্রেমচন্দের মৃত্যু হয় সেই থেকে এবং তুঙ্গে ওঠে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি। এই সময় পর্যায়ে উর্দু সাহিত্যজগতে অনেক সমৃদ্ধ উপলব্ধির জন্ম হয়।' এরপরে আন্দোলনের রূপ আর প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে

পশ্চিমের দরজা দিয়ে আরো কিছু নতুন উপাদান এসে এখানকার লেখকদের আলোড়িত করে।

এই তথ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, প্রেমচন্দ উর্দু সাহিত্যের বিরাণভূমিতে একা একা যে স্বর্ণোদ্যান রচনা করেছিলেন (বিশেষ করে উর্দু গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে), উর্দু সাহিত্যের আধুনিক লেখকরা তাকেই ভিত্তিভূমি ধরে নিয়ে সেখান থেকেই তাদের যাত্রা শুরু করেছেন। এই ব্যাপারটা আরেকটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

প্রেমচন্দ্রের নামোল্লেখের আগে-পিছে কিছু বিশেষণ যুক্ত করা হয় কেন? উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় মানুষের মাতৃভাষা (হিন্দি) উর্দু। বিশ শতকের গোড়াতেও এই ভাষার সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি, গল্প-উপন্যাসের পটভূমিতে যুক্ত হয়নি সমকাল, না-মাটি না-মানুষ কোনো কিছুরই পরিচয় মেলেনি এখানকার সাহিত্যকর্মে। অতীতের অবক্ষয়ী রোমান্টিকতার অলীক অন্ধকারে ডুবে ছিল যেন সবাই, জীবনের সবটুকুকে আড়ালে রেখে এই সমাজের সাহিত্যিক ধারা যেন জীর্ণতায় ধুকপুক করছিল। প্রেমচন্দের আবির্ভাব এরই মধ্যে। বারাণসীর এক অখ্যাত গাঁয়ের নিম্ন-মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মে, পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানির চাকরি করতে করতে প্রেমচন্দ উর্দু সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের উপযোগী করে গড়ে তুললেন। সমকালীন মানুষগুলো, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের আটপৌরে কৃষক উর্দু সাহিত্যে এই প্রথমবারের মতো উঠে এল তাদের ভাবনা-বেদনা, সুখ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, দোষ-গুণের সামগ্রিক পরিচয় নিয়ে—জীবনের অনাবিল প্রসন্ন স্রোতধারায় উর্দু সাহিত্যের নবজন্ম ঘটল। কথাটি হিন্দি সাহিত্যের বেলাতেও প্রযোজ্য; কেননা এই পথিকৃৎ লেখক দুটো ভাষাতেই অবিরল লিখে গেছেন। তাই প্রেমচন্দ আধুনিক উর্দু (সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি) সাহিত্যের 'পিতৃস্থানীয়'। এই কাজগুলো তিনি সম্পাদন করেছিলেন 'কফন', 'সদগতি', 'পৌষের রাত'-এর মতো বিস্ময়কর গল্প এবং 'সেবাসদন', কিংবা 'গোদান'-এর মতো কালজয়ী উপন্যাস রচনার মাধ্যমে। প্রবহমান তরল রোমান্টিক সেন্টিমেন্টের বিপরীতে তিনি রূঢ়, বর্ণহীন, কঠোর সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপকে মুখোমুখি দাঁড় করালেন পাঠকের। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত করলেন মানুষের ওপর এক গভীরতম আস্থা : মানুষ মূলত ভালো, মূলত মহৎ, সে দৃঢ়পণ চেষ্টায় নিজেকে সকল সামাজিক পাপ-পঙ্কিলতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে সার্থক হয়ে উঠতে পারে...।

এভাবেই তিনি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে যে বলিষ্ঠ হাল তুলে দিয়ে গেলেন, সেই হাল ধরেই পালে বাতাস লাগিয়ে নবীন লেখকদের এগিয়ে যেতে আর বাধা রইল না।

প্রগতিশীল আন্দোলন উর্দু সাহিত্যে একঝাঁক মেধাবী লেখকের জন্ম দিয়েছিল। বয়সের দিক থেকে দু'-এক বছর ছোট-বড় হলেও এরা সবাই মোটামুটি সমসাময়িক ছিলেন : কৃষণ চন্দর, রাজেন্দ্র সিংহ বেদী, ইসমত চুগতাই, সাদত হাসান মান্টো, খাজা আহমদ আব্বাস, কুররাতুল আইন হায়দার, কুদরতুল্লা শাহাব, গোলাম আব্বাস প্রমুখ এদের অন্যতম। আজকের উর্দু কথাসাহিত্যের ভেতরে যে বৈচিত্র্যের বিবিধ আস্বাদ আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করি তা এদেরই দান।

এই নবীন গোষ্ঠীর মধ্যে আবার কৃষণ চন্দর-এর নামটি নানা কারণে অধিক উচ্চারিত। তাঁর রচনার নৈপুণ্য, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ক্ষিপ্রতা,

বিষয়মাহাত্ম্য ও বাস্তবতা সহজেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। '৪৭-এর দেশভাগ, দাঙ্গা, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে লাঞ্ছিত-বঞ্চিতরাই তাঁর লেখার একটি অতি প্রিয় বিষয়। পেশাদার লেখক ছিলেন বলেই যদিও বিস্তর লিখতে হয়েছে তাঁকে, তবু তেলেঙ্গানার পটভূমিতে লেখা কৃষক আন্দোলনের কাহিনী 'যব ক্ষেত জাগে' দেশভাগের পটভূমিকার 'গাদ্দার' উপন্যাস, একই বিষয়ে লেখা ছোটগল্প 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' পাঠকের মনে স্থায়ী দাগ কেটে যায়। কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক চেতনা এবং ইতিহাসবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর, শানানো। নির্বাচিত অন্য দুটি গল্প 'জঞ্জালবুড়ো' এবং 'জামগাছ'-এ কৃষণ চন্দরের সেই চেতনা ও বোধেরই পরিচয় মেলে।

রাজেন্দ্র সিংহ বেদীকে বলা হয় উর্দু সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক ধারার প্রবর্তক। তাঁর গল্পের স্বর গাঢ় এবং গম্ভীর। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপড়েন, সেখানে বর্ণহীন বাস্তবতার প্রক্ষেপ আর মনস্তত্ত্বের চাপ সব মিলিয়ে যেখানে একটি সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে অচেনা মানুষ, সহজ সম্পর্ক হয়ে ওঠে অজানা সম্পর্ক... সেই জটিল ও অজানা অচেনা মানুষজন রাজেন্দ্র সিংহ বেদীর প্রিয় বিষয় আশয়।

উর্দু সাহিত্যে বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত লেখক হিসেবে সাদত হাসান মান্টোর খ্যাতি রয়েছে। হয়তো এই ব্যাপক পরিচিতির পেছনে আছে মান্টোর বিরুদ্ধে সেন্সরসিপের বারংবার মামলা দায়েরের ঘটনা। আশ্চর্য যে, মান্টোর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোই সেন্সরশিপের কোপানলে পড়েছিল। 'ধোঁয়া', 'খুলে দাও', 'ঠাণ্ডা গোশত', 'গন্ধ', এগুলো সবই অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত। এমনিতেও মান্টো সমাজের নিঃস্ব, রিক্ত, পতিতদের নিয়েই কাজ করতেন। অন্ধগলির পতিতাদের চরিত্র প্রকাশ্য আলোয় তুলে ধরতেন—যা কর্তাদের কর্তব্যনিষ্ঠ চোখে প্রায়ই দৃষ্টিকটু ঠেকত। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মান্টো মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান।

সাদত হাসান মান্টোর নামের সঙ্গে সঙ্গে অবধারিতভাবেই উচ্চারিত হয় আরেকটি নাম—তিনি ইসমত চুগতাই। উর্দু সাহিত্যে দু'জনের আগমন প্রায় একসঙ্গে এবং আবির্ভাবের শুরুতে দু'জনেই হুলুস্থুল তুলেছিলেন উর্দু সাহিত্যে। মান্টোর মতো ইসমত চুগতাই-কেও একাধিকবার অশ্লীলতার দায়ে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। দু'জনের মামলা চলেছে প্রায় একই সঙ্গে। ৩০-৪০-এর দশকে দু'জনেই একসঙ্গে বোম্বাই সিনেমার গল্প লিখেছেন।

যাই হোক, ইসমত চুগতাইয়ের মৌলিক হাত মূলত ছোটগল্পে। তাঁর বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা, লেখার ভঙ্গি নিরুচ্ছ্বাস অথচ সংবেদনশীলতাই তাঁর গল্পকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। উত্তর-ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের অবস্থা এমন ব্যাপক ও স্পর্শকাতরভাবে ফুটিয়ে তুলতে কম লেখকই পেরেছেন। এখানে তার নির্বাচিত 'দুই হাত' গল্পটি ছাড়াও 'গুডডির নানী' একটি উৎকৃষ্ট লেখা।

খাজা আহমদ আব্বাস (১৪ই জুন, ১৯১৪)-এর জন্ম ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথে। ভাষার ব্যবহার ইনি অত্যন্ত সহজ, সাদামাটা। শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন। 'ইনকেলাব' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। বিশিষ্ট উর্দু লেখিকা কুররাতুল আইন হায়দারকে তিনি বিয়ে করেছিলেন যদিও তা দীর্ঘদিন টেকেনি। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি গল্প লেখার

চেয়ে চলচ্চিত্রের কাহিনী ও সংলাপ রচনা, চিত্র পরিচালনা ও চিত্র প্রযোজনায় মনোনিবেশ করেন।

উর্দু কথাসাহিত্যে আমরা উপরে আলোচিত লেখকদের সঙ্গে যেভাবে পরিচিত, কুররাতুল আইন হায়দার, কুদরতুল্লা শাহাব কিংবা গোলাম আব্বাস-এর সঙ্গে ঠিক সেভাবে পরিচিত নই। যদিও এই সংকলনভুক্ত তাঁদের গল্পগুলো স্ব-উজ্জ্বলতার ভাস্বর এবং উর্দু গল্পের ধারাবাহিক আলোচনায় এঁরা এসে পড়েন অনিবার্যভাবেই।

এখানে একটি কথা উল্লেখ প্রয়োজন যে, উর্দু সাহিত্যের এক ব্যাপক অংশ বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখক অনুবাদ করেছেন। অথচ এই সংকলনের জন্য নির্বাচনকালে যখন অনুবাদ গ্রন্থগুলোর মুখোমুখি হলাম, আমরা দেখলাম অধিকাংশ অনুবাদকই ন্যূনতম কোনো শৃঙ্খলা মেনে চলেননি। ফলে ঘটনা ঘটেছে এরকম যে, পাঠক একজন উর্দু গল্পকারের অনেক গল্প পড়ছেন ঠিকই কিন্তু তার পাঠ থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে সেরা গল্পগুলো। দ্বিতীয়ত, রূপান্তরিত গল্পগুলোর কিছু কিছু জায়গায় আড়ষ্টতাও ধরা পড়েছে। তবু অনুবাদকদের মিলিত চেষ্টায় উর্দু ভাষার একটা ঐশ্বর্যময় সম্ভার বাংলার ভাষায় অনূদিত ছিল বলেই দুই খণ্ডে উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্প বের করা সম্ভব ছিল। অনুবাদকদের কাছে আমাদের ঋণ তাই অপরিশোধ্য। ভবিষ্যতে নতুন অনুবাদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উর্দু গল্পকে সম্পন্নতর করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এই গ্রন্থে উর্দু কথাসাহিত্যের সেরা লেখকদের সেরা গল্পগুলোর সন্নিবেশের ফলে পাঠক একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন—আমরা এই আশা রাখি।

২২/২, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ঢাকা

শহিদুল আলম

সূচি

সদ্‌গতি ॥ প্রেমচন্দ	১১
জঞ্জাল-বুড়ো ॥ কৃষণ চন্দর	১৮
মিথুন ॥ রাজেন্দ্র সিংহ বেদী	২৭
দুই হাত ॥ ইসমত চুগতাই	৩৭
খুলে দাও ॥ সাদত হাসান মান্টো	৪৫
সর্দারজি ॥ খাজা আহমদ আব্বাস	৪৮
প্রতিশোধ ॥ খাজা আহমদ আব্বাস	৫৭
মা ॥ কুদরতুল্লাহ শাহাব	৬৫

সদ্‌গতি
প্রেমচন্দ

বাড়ির দরজায় ঝাঁট দিচ্ছে দুখী চামার। ওর বৌ ঝুরিয়া গোবর দিয়ে ঘর নিকোচ্ছে। দু'জনেরই কাজ সারা হলে ঝুরিয়া দুখীকে বলল, এবার তাহলে তুই গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে বলে আয়, উনি আবার অন্য কোথাও বেরিয়ে-টেরিয়ে যান।

দুখী—হ্যাঁ যাচ্ছি, কিন্তু ভেবে দেখ্ তো উনি বসবেন কিসে?

ঝুরিয়া—কোথাও একটা খাটিয়া-ফাটিয়া পাবি না? বামুনপাড়া থেকে না-হয় একটা চেয়ে নিয়ে আসিস।

দুখী—তুই মাঝেমাঝে এমন সব কথা বলিস যে, শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। বামুনপাড়ার ওনারা আমাকে খাটিয়া দেবে কেন! একটুকুন আগুন পর্যন্ত বাড়ি থেকে দেয় না, খাটিয়া দেবে! কুয়োর ধারে গিয়ে এক ঘটি জল চেয়ে পাই না, আর খাটিয়া দেবে! এ কি আমাদের ঘুঁটে, কঞ্চি, ভূষা কিংবা কাঠ যে, যার যেমন খুশি নিয়ে চলে যাবে। নে, আমাদের খাটিয়াটাকেই ধুয়েটুয়ে রেখে দে। গরমের দিন, ঠাকুরমশাই আসতে-আসতে শুকিয়ে যাবে।

ঝুরিয়া—আমাদের খাটিয়াতে উনি বসবেন না। দেখিসনি কী রকম আচারে-বিচারে থাকেন।

দুখী একটু চিন্তিত হয়ে বলল, তাও তো বটে। তাহলে মহুয়াপাতা পেড়ে এনে একটা আসন বানিয়ে নিলে হয় না। মহুয়া তো বড়-বড় লোকেরা খায়। মহুয়াপাতা পবিত্তর। দে তো লাঠিটা, ক'টা পাতা পেড়ে আনি।

ঝুরিয়া—পাতা দিয়ে আসন আমি বানিয়ে রাখবখন। তুই যা। আর হ্যাঁ, ঠাকুরমশাইয়ের জন্যে তো সিধেও নিতে হবে। আমাদের থালাটাতে সিধে সাজিয়ে রেখে দেব।

দুখী—কক্‌খনো অমন সব্বনাশটি করিস না। তাহলে সিধেও যাবে, থালাখানাও ভাঙা পড়বে। একটান মেরে বাবাঠাকুর থালাখানাকে ছুড়ে ফেলে দেবেন। ওনার বড্ড তাড়াতাড়ি রাগ চেপে যায়, রাগ চাপলে বামুনমাকেও ছেড়ে কথা কন না; ছেলেটাকে তো এই সেদিন এমন ঠ্যাঙানি ঠেঙিয়েছেন যে, বেচারা আজও ভাঙা হাত নিয়ে ঘুরছে। পাতাতে করেই সিধে দিস। হ্যাঁ, দেখিস তুই কিন্তু কিচ্ছু ছুঁস না। গোঁড়ের মেয়েকে ডেকে নিয়ে সাহুর দোকান থেকে সব জিনিস নিয়ে আসিস। সিধেতে সব জিনিস যেন ঠিক থাকে। সেরখানেক আটা, আধ সের চাল, পোয়াটাক ডাল, আধপো ঘি, নুন-হলুদ

দিস আর পাতার এক কোণে চার আনা পয়সাও রেখে দিস। গোঁড়ের মেয়েকে না-পেলে তুই ভুর্জিনাক হাতে-পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে যাস। দেখিস তুই কিন্তু কিচ্ছু ছুঁস না, তাহলে সব্বনাশ হয়ে যাবে।

সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে-পড়িয়ে দুখী লাঠিটা নিয়ে ঘাসের একটা বড়সড় গাঁটরি মাথায় চাপিয়ে পণ্ডিতমশাইকে খোশামুদি করতে চলল। খালি হাতে বাবাঠাকুরের সামনে যায় কোন মুখে। আর নজরানা বলতে ঘাস ছাড়া ওর কাছে আর কিই-বা আছে। ওকে খালি হাতে দেখলে ঠাকুরমশাই তফাৎ থেকেই যে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবেন।

দুই

পণ্ডিত ঘাসীরাম পরম ঈশ্বরভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই পূজার্চনা নিয়ে পড়েন। হাতমুখ ধুতে-ধুতে আটটা বাজে। তারপর শুরু হয় পুজো। পুজোর প্রথম কাজ হল ভাঙ ঘোঁটা। তারপর আধঘন্টা ধরে বসে চন্দন ঘষেন, আয়নার সামনে বসে একটা কাঠি দিয়ে কপালে তিলক আঁকেন। চন্দনের দুটো রেখার মাঝখানে সিঁদুরের লাল ফোঁটা কাটেন। একে-একে বুকে, হাতে, গোল-গোল মুদ্রা আঁকেন চন্দনের। এরপর ঠাকুরের বিগ্রহকে স্নান করান, চন্দন দিয়ে সাজান, সামনে ফুল দেন, আরতি করেন, ঘন্টা বাজান। দশটা নাগাদ উনি পুজো সেরে ওঠেন। ভাঙের শরবত খেয়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ততক্ষণে দু'-চারজন যজমান এসে পড়ে বাড়িতে। ঠাকুরপুজোর ফল হাতে-হাতে পেয়ে যান। এই হল ওঁর পেশা।

আজ ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি দেখেন দুখী চামার এক গাঁটরি ঘাস নিয়ে বসে আছে। দুখী ওঁকে দেখেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে জোড়হাতে উঠে দাঁড়ায়। বাবাঠাকুরের তেজোময় মূর্তি দেখে দুখীর হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে! আহা কী দিব্য মূর্তি। ছোটখাট গোলগাল চেহারা, মসৃণ ভাল, প্রসন্ন বদন, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত নয়ন। সিঁদুরে আর চন্দনরেখায় দেখাচ্ছে যেন দেবতা!

দুখীকে দেখে শ্রীমুখে বলে ওঠেন, আজ কী মনে করে এলি রে দুখীয়া!

দুখী মাথা হেঁট করে বলে, মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছি বাবাঠাকুর! পাঁজিপুঁথি দেখে একটা শুভলগ্ন দেখে দিতে হবে যে। কখন দয়া হবে বাবা?

ঘাসী—আজ তো সময় হবে না রে। ঠিক আছে, না-হয় সন্ধে নাগাদ যাব।

দুখী—না না, বাবাঠাকুর, একটু তাড়াতাড়ি চলুন। আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখে এসেছি। এই ঘাসটা কোথায় রাখি?

ঘাসী—এই গরুটার সামনে দিয়ে দে ওটা। আর ঝাড়ুগাছা নিয়ে বাড়ির দরজাটা একটু ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে দে তো। বৈঠকখানাটাও আজ ক'দিন ধরে লেপা-পোঁচা হয়নি। ওটাকে একটু গোবর দিয়ে লেপে দে। আমি ততক্ষণে সেবাটেবা সেরে নিই। তারপর একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে যাব। হ্যাঁ, এই কাঠটাকেও একটু চিরে দিস তো। আর শোন, খামারে ঝুড়ি চারেক ভূষি পড়ে আছে, ওগুলোকে নিয়ে এসে ভূষি রাখার ঘরটায় রেখে দিস, কেমন।

দুখী সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম তামিল করতে শুরু করে দিল। দরজায় ঝাড়ু দিল, বৈঠকখানাকে নিকিয়ে দিল গোবর দিয়ে। এসব কাজ সারতে-সারতে বেলা বারোটা বেজে গেল। পণ্ডিতমশাই খেতে যান। দুখী সকাল থেকে কিছু খায়নি। জোর খিদে পেয়েছে ওরও; কিন্তু এখানে কে ওকে খেতে বলেন। বাড়ি এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। বাড়ি খেতে গেলে পণ্ডিতমশাই যদি রাগ করেন। বেচারা খিদে চেপে কাঠ চিরতে শুরু করল। মোটা মতন একটা গাঁট, এর ওপর এর আগে কত-না শিষ্য তাদের শক্তি পরীক্ষা করছে। দুখীও একই শক্তি আর দৃঢ়তার সঙ্গে এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হল। দুখীর কাজ ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচা। কাঠ চোরার অভ্যাস আদৌ নেই তার। ঘাস ওর খুরপির সামনে মাথা নোয়ায়। দুখী ঠিকরে যায়। ঘেমে নেমে ওঠে দুখী, হাঁপাতে থাকে, অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায়। হাত ওঠাতে গিয়ে ওঠাতে পারে না। পা দুটো কাঁপে, কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে! তবুও সে কাজ করে চলে। ভাবে, এক ছিলিম তামাক যদি টানতে পেতাম হয়তো একটু তাগদ পেতাম। কিন্তু কলকে তামাক এখানে পাব কোথায়? বামুনদের পাড়া। বামুনরা তো আর আমাদের নিচু জাতের মতন তামাক খায় না। হঠাৎ খেয়াল হয় এ-গাঁয়ে তো এক ঘর গোঁড়ও আছে। ওর কাছে গেলে ঠিকই কল্কে-তামাক পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে দুখী ছোটে ওর বাড়ি। যাক্, পরিশ্রম সার্থক হয়—সে তামাক দেয়। কিন্তু আগুন পাওয়া গেল না সেখানে। দুখী বলে, আগুনের জন্য ভেব-না ভাই! আমি যাচ্ছি, পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি থেকে চেয়ে নেব। ওঁর বাড়িতে তো এই একটু আগেও রান্না হচ্ছিল।

এই বলে জিনিস দুটো নিয়ে দুখী চলে আসে। পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির দেউড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকে, বাবাঠাকুর, একটুন আগুন যদি পেতাম এক ছিলিম তামাক টেনে নিতাম।

পণ্ডিতমশাই খেতে বসেছিল। বামুনগিন্নী জিজ্ঞেস করেন, আগুন চাইছে কে এটা?

পণ্ডিত—আরে ওই শালা দুখিয়া চামার। ওকে বলেছি কাঠটাকে একটু চিরে দিতে। আগুন তো রয়েছে, দাও-না একটু।

বামুনগিন্নী ভুরু কুঁচকে বলে ওঠেন, পুঁথিপত্তরের ফেরে পড়ে ধরম-করম সব কিছুর তো মাথা খেয়ে বসে আছ। চামার হোক, ধোপা হোক, নাপিত হোক, মাথা উঁচু করে একেবারে ভেতরবাড়িতে চলে আসবে! এ যেন হিন্দুর বাড়ি নয়, একটা সরাইখানা। বলে দাও পোড়ারমুখোকে চলে যেতে, না হলে এই পোড়াকাঠ দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেব। আগুন চাইতে এসেছে!

পণ্ডিতমশাই বুঝিয়ে বলেন, ভেতরে চলে এসেছে তো কী হয়েছে? তোমার তো কোনো কিছু ছোঁয়নি। মাটি হল পবিত্র। একটুখানি আগুন দিয়ে দিচ্ছ-না কেন? কাজটা তো আমাদেরই করছে। কোনো মজুর লাগিয়ে এই কাঠ চেলাতে গেলে কম করে চার আনা পয়সা তো নিত।

বামুনগিন্নি মুখঝামটা দিয়ে বলেন, ওটা বাড়িতে ঢুকেছে কেন?

হার মেনে বলেন পণ্ডিতমশাই—শালার কপাল খারাপ, এছাড়া আর কী?

বামুনগিন্নী—বেশ, এবারের মতো আগুন দিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু আবার যদি এভাবে কোনো ব্যাটা বাড়িতে ঢোকে তো তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব।

সব কথাই কানে আসে দুখীর। মনে-মনে পস্তাচ্ছে—কেন যে শুধু-শুধু এলাম। সত্যি কথাই তো। বামুনপণ্ডিতের বাড়ির ভেতরে চামার ঢোকে কী করে! বড় পবিত্তর এনারা, তাই তো দুনিয়ার সবাই এত খাতির করে, তাই তো এত মান্যিগন্যি। মুচি-চামার তো নয়। এই গাঁয়েই বুড়ো হলাম। আর এ আক্কেলটুকুন হল-না আমার। তাই বামুনগিন্নী আগুন নিয়ে বেরুলে দুখী যেন হাতে স্বর্গ পায়। জোড় হাত করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলে, মা-ঠাকরুণ, বড় ভুল হয়ে গেছে গো। বাড়ির ভেতরে চলে এসেছি। চামারের বুদ্ধি তো মা! এতটা মুখ্যসুখ্য যদি নাই হব, তাহলে লাথিঝেঁটা খাব কেন?

বামুনগিন্নী চিমটেয় ধরে আগুন এনেছেন। হাতপাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে আগুনটাকে দুখীর দিকে ছুড়ে দিলেন। বড় একটা আগুনের টুকরো এসে দুখীর মাথায় পড়ল। তাড়াতাড়ি পিছু হটে সে মাথা ঝাঁকাল। তার মন বলে উঠল, এ হল গে পবিত্তর বামুনের বাড়িকে অপবিত্তর করার সাজা। ভগবান হাতে-হাতে সাজা দিয়ে দিয়েছেন। এ-জন্যেই তো সারা দুনিয়া বামুনদের এত ভয় করে। অন্যসব লোকের টাকা-পয়সা মার যায়। কই বামুনদের পয়সা মেরে নিক তো কেউ। গুষ্টিসুদ্ধ সবার সব্বনাশ হয়ে যাবে না, পা পচে-পড়ে খসে পড়বে-না!

বাইরে এসে সে তামাক খায়, তারপর আবার কুড়ুল নিয়ে কাজে লেগে পড়ে। খটাখট আওয়াজ আসতে থাকে।

ওর গায়ে আগুন পড়েছে, তাই বামুনঠাকরুনের একটু মায়া হয় দুখীর ওপর। পণ্ডিতমশাই খেয়ে উঠলে বলেন, চামারটাকে একটু কিছু খেতেটেতে দাও, বেচারা সেই কখন থেকে কাজ করছে, খিদে থাকতেই পারে।

পণ্ডিতমশাই এই প্রস্তাবটার বাস্তব দিকটা উপলব্ধি করে জিজ্ঞেস করেন, রুটি আছে?

পণ্ডিতগিন্নী—দু'চারখানা হয়তো বেঁচে যাবে।

পণ্ডিত—দু'চারখানা রুটিতে কী হবে? ব্যাটা চামার, কম করে সেরখানেক তো গিলবে।

পণ্ডিতগিন্নী কানে হাত দিয়ে বলেন, ওরে বাপ রে! সেরখানেক! তাহলে থাকগে।

পণ্ডিতমশাই এবার উল্টো চাপ দেন, বলেন—কিছু ভুষি-টুষি থাকলে আটার সঙ্গে মিশিয়ে দু'খানা মোটা চাপাটি সেঁকে দাও না, শালার পেট ভরে যাবে। ওই পাতলা-পাতলা রুটিতে এসব ছোটলোকের পেট ভরে না। এদের তো জোয়ারের মোটা চাপাটি চাই।

পণ্ডিতগিন্নী বলেন, ছাড়ো তো, এই দুপুর-রোদে কে মরতে যাবে ওসব করে।

তিন

দুখী তামাক খেয়ে আবার কুড়ুল নেয়। দম নিয়ে হাতে একটু জোর পায়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে কুড়ুল চালিয়ে যায়। তারপর অবসন্ন হয়ে সেখানে মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়ে।

এর মধ্যে গোঁড় এসে পড়ে। বলে—কেন জানটা খোয়াচ্ছ বুড়োদাদা। কোপানিতে এই গাঁট ফাটবে না। শুধু-শুধু হয়রান হচ্ছ।

কপালের ঘাম মুছে দুখী বলে—এখনো একগাড়ি ভুষি বয়ে আনতে হবে রে ভাই।

গোঁড়—খেতে-টেতে কিছু দিয়েছে, না শুধু কাজই করিয়ে চলেছে। গিয়ে চেয়েটেয়ে কিছু নিচ্ছ-না কেন?

দুখী—বলছ কী চিখুরী! বামুনের অন্ন কি আমাদের পেটে হজম হবে?

গোঁড়া—হজম ঠিকই হবে, আগে পাও তো। গোঁফে তা দিয়ে তো ঠিকই খেয়ে নিয়ে তোমাকে কাঠ চেরার হুকুম দিয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছে, জমিদারও তো কিছু না-কিছু খেতে দেন। হাকিমও বেগার খাটালে কিছু না-কিছু মজুরি দেন। ইনি ওঁদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। নিজেকে ধাম্মিক বলে জাহির করছেন।

দুখী—আস্তে-আস্তে বল্‌রে ভাই, শুনে-টুনে ফেললে বিপদ হবে।

বলে দুখী আবার কুড়ুল চালাতে লাগল। দুখীকে দেখে চিখুরীর দয়া হল। এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে কুড়ুলখানাকে কেড়ে নিয়ে একনাগাড়ে আধঘণ্টা খুব জোরে-জোরে কুড়ুল চালাল; কিন্তু গাঁটে একটুখানি ফাটও ধরল না। কুড়ুলটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে বলতে চাইলে—এ ঘাঁট চেরা তোমার কম্ম না, জান গেলেও পারবে না।

দুখী ভাবে—বাবাঠাকুর এই গাঁটটা পেলেন কোথায়, যাকে এত কুপিয়েও চেরা যাচ্ছে না। কোথাও একটুখানি চিড় পর্যন্ত খাচ্ছে না। আমি কতক্ষণ ধরে কোপাব এটাকে? ওদিকে বাড়িতে এখনও শতেক কাজ পড়ে রয়েছে। কাজকম্মের বাড়ি, একটা-না-একটা কাজ তো লেগেই আছে। কিন্তু এতে কার কী মাথাব্যথা! যাই ততক্ষণে না-হয় ভুষিগুলোই নিয়ে আসি। বলব, বাবাঠাকুর, আজ তো কাঠ চিরতে পারলাম না, কাল এসে না-হয় চিরে দেব।

ঝুড়ি মাথায় করে দুখী ভুষি বয়ে আনল। বাড়ি থেকে খামার দুফার্লংয়ের কম নয়। খুব চাপাচাপি করে ঝুড়ি যদি ভরে আনতে পারত তাহলে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত বটে, কিন্তু মাথায় তুলে দেবে কে ঝুড়ি। পুরোপুরি ঠাসা ঝুড়িটাকে একা মাথায় তুলতে পারে না। তাই অল্প-অল্প করেই আনে। চারটে নাগাদ ভুষি আনা তার শেষ হয়। পণ্ডিতমশাইয়েরও ঘুম ভাঙে। মুখ-হাত ধুয়ে, পান খেয়ে বাইরে আসেন। দেখেন ঝুড়ির ওপর মাথা রেখে দুখী ঘুমুচ্ছে। জোরে হাঁক দেন—ওরে ও দুখিয়া! বলি, ঘুমুচ্ছিস? কাঠ তো এখনো যেমনকার ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে। এতক্ষণ তুই করছিলি কী? একমুঠো ভূষো আনতেই দিন কাবার করে ফেললি। তার ওপর আবার পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছিস? নে নে, তোল কুড়ুল। কাঠটা চিরে দে। তোকে দিয়ে একটুখানি কাঠ চেরানোও যায় না। লগনও তাহলে তেমনি হবে বুঝলি, আমাকে কিন্তু তখন দুষতে পারবি না। সাধে বলে, ছোট জাতের ঘরে খাবার জুটল তো ব্যস ওদের মতিও পালটে গেল।

দুখী আবার কুড়ুল হাতে নিল। যেকথা বলবে বলে ভেবে রেখেছিল, সেসব ভুলে গেল। পেট পিঠে লেগে গেছে। সেই সক্কাল থেকে জলটুকু পর্যন্ত খায়নি। সময়ই পায়নি। উঠে দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। দেহ বসে যাচ্ছে। তবু মনটাকে শক্ত করে উঠে দাঁড়াল সে। পণ্ডিতমশাই শুভ সময়টা ঠিকমতো যদি না-দেখে দেন, তাহলে হয়তো সব্বনাশ হয়ে যাবে। এ-জন্যেই তো সংসারে তাঁর এত খাতির, এত মান। শুভ মুহূর্তেরই তো সব খেলা। যাকে ইচ্ছে শেষ করে ফেলতে পারলে ইনি। পণ্ডিতমশাই কাঠটার কাছে

এসে দাঁড়ান, আর উৎসাহ দিয়ে যান—মার্ কষে, আবার মার্—কষে মার্—কী রে, মার না রে জোরে—তোর হাতে তো যেন জোরই নেই—লাগা কষে, দাঁড়িয়ে ভাবছিস কী! হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যস্ এই তো ফাটল বলে! দে দে, ওই ফাটলতাতেই আবার দে।

দুখীর হুঁশ থাকে না! না-জানি কী এক গুপ্তশক্তি ওর বাহু দুটিতে ভর করেছে। ক্লান্তি, অবসাদ, ক্ষুধা সবই যেন উবে যায়। নিজের বাহুবলে নিজেই অবাক। এক-একটি আঘাত পড়ছে যেন বজ্রের মতো। আধঘণ্টা ধরে উন্মাদের মতো সে কুড়ুল চালিয়ে যায়। শেষে কাঠখানাও মাঝখান দিয়ে ফেটে যায়। সেই সঙ্গে দুখীর হাত থেকে কুড়ুলটাও ছিটকে পড়ে। মাথা ঘুরে পড়ে যায় দুখী। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্লান্ত অবসন্ন শরীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

পণ্ডিতমশাই ডাকেন—নে রে, উঠে দু'চার কোপ আরও দিয়ে দে। পাতলা-পাতলা চ্যালা করে দে। দুখী ওঠে না। পণ্ডিতমশাইও ওকে আর এখন বিরক্ত করা উচিত মনে করেন না। ভেতরে গিয়ে ভাঙের শরবত খান, শৌচকর্ম সারেন, স্নান করেন, তারপর পণ্ডিতমশাইয়ের পোশাকে সেজেগুজে বাইরে আসেন। দেখেন দুখী তখনো একইভাবে পড়ে রয়েছে। পণ্ডিতমশাই জোরে ডাক দেন—অ্যাই দুখী, তুই কি শুয়েই থাকবি রে, চল তোর বাড়িতেই যাচ্ছি। সব জিনিসটিনিস ঠিকঠাক জোগাড় করে রেখেছিস তো? দুঃখী কিন্তু তবু ওঠে না।

এবার পণ্ডিতমশাইয়ের মনে ভয় হয়। কাছে গিয়ে দেখেন, দুখী টানটান হয়ে পড়ে আছে। ভড়কে গিয়ে ভেতরে ছোটেন, গিয়ে বামুনগিন্নীকে বলেন, দুখিয়াটা মনে হচ্ছে মরে গেছে।

পণ্ডিতগিন্নী হকচকিয়ে বলেন—তো! এক্ষুণি তো কাঠ চিরছিল!

পণ্ডিত—হ্যাঁ, কাঠ চিরতে-চিরতে মরে গেছে। সর্বনাশ হয়েছে, এখন কী হবে?

পণ্ডিতগিন্নী ঠাণ্ডা গলায় বলেন—কী আবার হবে, চামারবস্তিতে খবর পাঠিয়ে দাও মড়া তুলে নিয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গাঁয়ে খবর রটে যায়। বামুনদেরই ঘর সব। কেবল এক ঘর গোঁড়। ওদিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটা সবাই ছেড়ে দেয়। কুয়োতে যাবার রাস্তা ওদিক দিয়েই, জল আনবে কী করে! চামারের মড়ার পাশ দিয়ে জল আনতে যাবে কে? এক বুড়ি গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে বলে, এখনো মড়াটা ফেলাচ্ছ না যে। গাঁয়ে কেউ জলটল খাবে-না নাকি!

এদিকে চিখুরী চামারবস্তিতে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিয়ে আসে—খবরদার, মড়া আনতে কেউ যাবি না। এক্ষুনি পুলিশ আসবে, তদন্ত হবে। মজা পেয়েছ নাকি যে একটি গরিব বেচারাকে এভাবে পরানে মেরে ফেলবে। পণ্ডিতই হন আর যেই হন, সে তো নিজের কাছে। লাশ যদি তোরা আনিস তবে পুলিশ তোদেরও বেঁধে নিয়ে যাবে।

তার কথার পর-পরই পণ্ডিতমশাই গিয়ে পৌছান। কিন্তু চামারবস্তির কোনও লোক লাশ তুলে আনতে রাজি হয় না। শুধু দুখীর বউটা আর মেয়েটা হাহাকার করতে-করতে ছুটে যায়। পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির দরজায় গিয়ে ওরা কপাল চাপড়ে-চাপড়ে ডুকরে কাঁদতে থাকে। ওদের সঙ্গে আরও পাঁচ-দশটা চামার মেয়েছেলে—কেউ কাঁদছে, কেউ-বা ওদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। চামার বেটাছেলে নেই কেউ। পণ্ডিতমশাই চামারদের ওপরে খুব চোটপাট

করেন, বোঝান, কাকুতি-মিনতি করেন, কিন্তু চামারদের সবার মনে পুলিশের ভয় এতটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, একজনও রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে উনি ফিরে আসেন।

চার

মাঝরাত পর্যন্ত কান্নাকাটি চলে। ব্রাহ্মণ দেবতাদের পক্ষে ঘুমোনো মুশকিল হয়ে পড়ে। লাশ নিয়ে যেতে কোনও চামারই আসে না। এদিকে বামুনরাই-বা চামারের মড়া ছোঁবে কী করে। এমন কথাও কি কোনো শাস্ত্র-পুরাণে লেখা আছে? কই, দেখিয়ে দিক তো কেউ!

পণ্ডিতগিন্নী গজর-গজর করেন—এই ডাইনিগুলো তো মাথা খেয়ে ফেললে। এগুলোর গলাও ব্যথা করে না!

পণ্ডিতমশাই বলেন—কাঁদুক পেত্নীগুলো, কতক্ষণ কাঁদবে? যদ্দিন বেঁচে ছিল, কেউ একবার পোঁছেও নি। মরে গেছে, এখন চিল্লাচিল্লি করতে সবক'টা এসে জুটেছে।

পণ্ডিতগিন্নী—চামারের কান্না অলক্ষুণে নাকি গো?

পণ্ডিত—হ্যাঁ, বড্ড অমঙ্গলের।

পণ্ডিতগিন্নী—এখন থেকেই গন্ধ বেরুচ্ছে।

পণ্ডিত—চামার তো। খাদ্যাখাদ্যের কি কোনও বাছবিচার আছে ওগুলোর?

পণ্ডিতগিন্নী—ওগুলোর ঘেন্নাও করে না।

পণ্ডিত—সবক'টা ভ্রষ্ট।

রাত তো কাটল কোনও মতে, কিন্তু সকালেও কোনও চামার এল না। চামার মেয়েছেলেরাও কেঁদেকেটে চলে গেছে। একটু-একটু করে ছড়াতে শুরু করেছে দুর্গন্ধ। পণ্ডিতমশাই একগাছি দড়ি নিয়ে আসেন। দড়ির ফাঁস বানিয়ে মড়ার পায়ে ছুড়ে দেন। তারপর টান মেরে কষে নেন ফাঁসটা। আবছা-আবছা অন্ধকার। পণ্ডিতমশাই দড়ি ধরে লাশটাকে টানতে শুরু করেন। টানতে-টানতে গাঁয়ের বাইরে টেনে নিয়ে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে স্নান করে নেন চটপট, চণ্ডীপাঠ করেন। তারপর সারা বাড়িতে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দেন।

ওদিকে দুখীর লাশটাকে শেয়াল, শকুন, কুকুর আর কাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তার আজীবন ভক্তি, সেবা আর ধর্মনিষ্ঠার পুরস্কার!

জঞ্জাল-বুড়ো

কৃষণ চন্দর

যখন সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, তখন ওর পাদুটো কাঁপছে। ওর সারা শরীর ভেজা তুলোর মতো চুপসে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। ওর মন চলতে চাইছিল না, ওই ফুটপাথে বসে পড়তে চাইছিল।

জেল-হাসপাতালে তার আরো এক মাস থাকা উচিত ছিল, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে ছেড়ে দিলেন। হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে সে সাড়ে চার মাস ছিল আর দেড় মাস ছিল জেনারেল ওয়ার্ডে। এই সময়ের মধ্যে তার একটি কিডনি অপারেশন করে বাদ দেয়া হয়েছে, আর অন্ত্রের এক অংশ কেটে দিয়ে তার অন্ত্রের-ক্রিয়া ঠিক করে দেয়া হয়েছে। এখনো তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়নি। তবু হাসপাতাল ছেড়ে ওকে চলে আসতে হল, কারণ তার চেয়েও খারাপ অবস্থার অন্য রোগীরা প্রতীক্ষা করছে।

ডাক্তার তার হাতে এক লম্বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে বলেছিল, 'এই টনিক খেয়ো আর পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ো। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে, এখন আর হাসপাতালে থাকার কোনো আবশ্যকতা নেই।'

'ডাক্তার সাহেব, আমি আর হাঁটতে পারছি না।' সে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল।

'ঘরে যাও, কিছুদিন বিবি সেবাযত্ন করবে, বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে।'

খুব ধীরে-ধীরে টলমলে পদক্ষেপে ফুটপাত দিয়ে চলতে-চলতে সে ভাবল, 'ঘর!—কিন্তু আমার ঘর কোথায়?'

কিছুদিন আগেও আমার একটি ঘর নিশ্চয় ছিল—ছিল এক বিবিও; তার এক বাচ্চা হবার কথা ছিল। তারা দু'জনে ঐ আগতপ্রায় বাচ্চার কল্পনায় কত খুশি হয়েছিল। দুনিয়ার জনসংখ্যা অনেক হতে পারে, কিন্তু সে তো তাদের দু'জনের প্রথম সন্তান। দুনিয়ায় তাদের প্রথম সন্তান জন্ম নিতে আসছিল।

দুলারি খুব সুন্দর জামা সেলাই করেছিল নিজের বাচ্চার জন্য। হাসপাতালে তা নিয়ে এসে দেখিয়েছিল। আর ওই জামায় হাত বুলিয়ে তার মনে হয়েছিল যে, সে তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করছে।

কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে তাকে অনেক কিছুই হারাতে হল। যখন তার কিডনির প্রথম অপারেশন হয় তখন দুলারি নিজের গয়না বেচে দিয়েছিল। কারণ, গয়না তো এই রকম সময়ের জন্যই। লোকে ভাবে গয়না স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য, কিন্তু

আসলে অন্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যই তার ব্যবহার হয়। পতির অপারেশন, বাচ্চাদের লেখাপড়া, মেয়ের বিয়ে—এইসব প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রীলোকের গয়নার ব্যাংক খালি হয়। স্ত্রীলোক গয়নাগাটি সামলাতে ব্যস্ত থাকে, আর জীবনে বড়জোর-পাঁচ-ছ'বার এই গয়না পরবার সৌভাগ্য লাভ করে।

কিডনির দ্বিতীয় অপারেশনের আগে দুলারির বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল। তা তো হবেই—দুলারিকে দিনরাত খুব খাটুনি পোয়াতে হচ্ছিল, তার জন্যে এই বিপদ গোড়াতেই জমা ছিল। মনে হয়েছিল যে, দুলারির একহারা উজ্জ্বল শরীর এই কড়া খাটুনির জন্য তৈরি হয়নি। এইজন্য ঐ বুদ্ধিমান বাচ্চা মাঝপথেই সরে পড়েছে। বিরূপ পরিবেশ আর বাপ-মায়ের দুর্দশা আঁচ করতে পেরে সে নিজেই বুঝেছিল জন্ম নেয়া উচিত হবে না। কোনো-কোনো বাচ্চা এরকম বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। দুলারি কিছুদিন হাসপাতালে আসতে পারেনি। তারপর যখন এসে সে খবরটা দিল তখন দুলারির স্বামী খুব কেঁদেছিল। যদি তার জানা থাকত যে-ভবিষ্যতে তাকে আরো অনেক কাঁদতে হবে তাহলে এই ঘটনায় কান্নার বদলে সে সন্তোষ প্রকাশ করত।

কিডনির দ্বিতীয় অপারেশনের পর তার চাকরি চলে গেল। দীর্ঘকালীন রোগভোগে এইরকমই হয়, কে আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারে। রোগ তো মানুষের নিজস্ব ব্যাপার! এই কারণে যদি সে চায় যে তার চাকরি বজায় থাকবে, তবে তার দীর্ঘদিনের রোগভোগে পড়া ঠিক হবে না। মানুষ যন্ত্রের মতোই। যদি কোনো যন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে বিগড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে এক ধারে ফেলে রেখে দেয়া হয় আর তার জায়গায় নতুন যন্ত্র এসে যায়। কারণ কাজ থেমে থাকতে পারে না, ব্যবসা বন্ধ হতে পারে না, আর সময় থেমে থাকতে পারে না। কাজেই যখন তার উপলব্ধি হল যে, তার চাকরি চলে যাচ্ছে, তখন দ্বিতীয়বার কিডনি অপারেশনের সময় যে-রকম ধাক্কা লেগেছিল সে-রকমই লাগল। এই ধাক্কায় তার চোখ দিয়ে জলও পড়েনি। সে অনুভব করেছিল, তার হৃদয়ের মধ্যে এক শূন্যতা বিরাজ করছে, পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে মাটি আর নাড়িতে রক্তের বদলে দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে ভয়।

কিছুদিন যাবৎ আগামী দিনগুলোর কথা ভেবে ভয়ে সে ঘুমোতে পারেনি। অনেকদিনের রোগের চিকিৎসায় খরচও হল অনেক। এক-এক করে ঘরের সব দামি জিনিস বিক্রি হয়ে গেল, কিন্তু দুলারি হাল ছাড়েনি। সে তার স্বামীকে সাড়ে চার মাস প্রাইভেট ওয়ার্ডে রেখেছিল, সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা করিয়েছিল সে তার, এক-এক করে নিজের ঘরের সব জিনিস বেচে দিয়েছিল আর শেষ পর্যন্ত চাকরিও নিয়েছিল। দুলারি এক ফার্মে কর্মচারী হয়েছিল। একদিন তাদের ফার্মের মালিককে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল দুলারি। মালিক এক রোগা-পাতলা বেঁটে মতো লোক, মাঝবয়েসী আর লাজুক। তাকে দেখতে-শুনতে কোনো ফার্মের মালিকের বদলে কোনো দোকানের মালিক বলে মনে হয়। দুলারিকে ওই ফার্মে দু'শ' টাকার মাসমাহিনার কর্মচারী হয়ে যেতে হল, কেননা সে খুব বেশি লেখাপড়া জানত না। তার কাজ ছিল খামের উপর ডাকটিকিট লাগানো।

দুলারির স্বামী বলল, 'এ খুব সহজ কাজ।'

ফার্মের মালিক বললেন, 'কাজ তো সোজাই, কিন্তু যেদিন পাঁচ-ছশ' চিঠির খামের উপর টিকিট লাগাতে হয় সেদিন এই খুব সোজা কাজই খুব কঠিন মনে হয়।'

দুলারি মুচকি হেসে বলল, 'সত্যি খুব হয়রান হয়ে যাই।'

ফার্মের মালিক তাকে বললেন, 'তুমি সেরে ওঠ, তারপর তুমি তোমার বিবির বদলে খামে টিকিট লাগিয়ো, আমি এই কাজ তোমাকে দেব।'

যখন ফার্মের মালিক চলে যাচ্ছেন তখন দুলারিও তার সঙ্গে চলে গেল। দুলারির স্বামী অনুভব করল যে, আজ দুলারির পদক্ষেপে এক অদ্ভুত আত্মমর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে। দুলারির শরীর কোনো এক ফুলন্ত ডালের মতো নমনীয় হয়ে গেছে। ওয়ার্ডের বাইরে এসে মালিক দুলারির জন্যে এক হাতে দরজা খুলে ধরে দুলারিকে দরজার বাইরে যেতে সাহায্য করতে কিছুটা ঝুঁকে পড়লেন, আর এক মুহূর্তের জন্য তাঁর অপর হাত দুলারির কোমরের ওপর রাখলেন। ফার্মের মালিকের প্রথম হাতের ভঙ্গি দুলারির স্বামীর ভালো লেগেছিল কিন্তু দ্বিতীয় হাতের ভঙ্গি পছন্দ হয়নি। কিন্তু সে আপন মনকে এ-কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে, কখনো-কখনো এক হাত যা করে তা অপর হাত জানতে পারে না। আবার এ-ও তো হতে পারে যে, তার চোখের নজর ঠিক নেই—কেবল ভ্রম মাত্র—এ-কারণে সে বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের চোখ দুটি বন্ধ করে নরম-নরম বালিশের ওপর মাথা রেখে গ্লুকোজ ইনজেকশনের প্রতীক্ষা করেছিল।

তার তৃতীয় অপারেশন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে হয়েছিল। সে সময় দুলারি ফার্মের মালিকের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কে আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারে! জীবন ক্ষণস্থায়ী আর জীবনের বসন্ত তার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী। যখন আবেগ প্রবল হয় আর চোখে নেশা লাগে, যখন আঙুলের ডগায় আগুনের জ্বলুনি অনুভূত হয় আর বুকে মিষ্টি-মিষ্টি বেদনা হতে থাকে, যখন চুম্বন ভ্রমরের মতো ওষ্ঠের পাপড়ির ওপর এসে পড়ে আর বঙ্কিম হংসগ্রীবা কারো গরম-গরম নিঃশ্বাসের মৃদু আঁচে ব্যাকুল হয়, তখন কে কতদিন পর্যন্ত ফিনাইল আর পেচ্ছাবের গন্ধ শুঁকতে পারে, থুতু, পুঁজ আর রক্তের রঙ দেখতে পারে আর মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে-আসা হেঁচকি শুনতে পারে? সহ্য করার একটা সীমা আছে; বিশ বছরের যুবতী সহ্য কি করেনি? যার বিয়ের পর দু'বছরও পেরোয়নি, যে আপন পতির সঙ্গে বিপদ ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, সে যদি আপন স্বপ্নে ভর করে দার্জিলিং চলে যায় তবে তাতে কার কী দোষ?

দুলারি যখন বাড়ি থেকে চলে যায় তখন দুলারির স্বামী অন্য কাউকে দোষী বলার মতো অবস্থা থেকে চ্যুত হয়েছিল। তার ওপর একটার পর একটা আঘাত এসে তাকে পাগল করে তুলেছিল। এখন তার বিপদ আর কষ্টে কোনো ভাবনা বা অশ্রু ছিল না। বারবার হাতুড়ির চোট খেয়ে ধাতুর পাতের মতো হয়ে গিয়েছিল তার হৃদয়। এই কারণে আজ সে (দুলারির স্বামী) যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল তখন সে ডাক্তারের কাছে কোনো মানসিক যন্ত্রণার কথা বলেনি। সে ডাক্তারকে বলেনি, এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এখন সে কোথায় যাবে? এখন তার নেই কোনো ঘর, নেই বিবি, নেই বাচ্চা, নেই কোনো চাকরি, তার হৃদয় শূন্য, তার পকেট ফাঁকা; তার সামনে এক বিরাট শূন্য ভবিষ্যৎ।

কিন্তু তখন সে কোনো কথাই বলেনি, কেবল বলেছিল, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আর চলতে পারছি না।'

ওই একমাত্র সত্য তখন সে অনুভব করেছিল, বাকি সব কথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তার মন থেকে। এ সময় চলতে-চলতে সে কেবল অনুভব করতে পারল যে, তার শরীর ভিজে তুলো দিয়ে তৈরি, তার শিরদাঁড়া কোনো পুরনো ভাঙা চারপাইয়ের মতো খটখট করছে। রোদের তেজ খুব, আলো তীরের মতো চোখে বিঁধছে, আকাশে এক ময়লা হলুদ রঙের বার্নিশ লেপে দেয়া হয়েছে। সারা পরিবেশ কালো ঘোলাটে আর জড়ো-হওয়া নোংরা মাছির মতো ভনভন করছে। লোকের দৃষ্টি যেন তার গায়ের নোংরা রক্ত ও পুঁজের মতো তার শরীরে সেঁটে যাচ্ছে। তাকে কোথাও পালিয়ে যেতে হবে, দূরে কোথাও, লম্বা লম্বা তার-জড়ানো আলোর থামওয়ালা রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, তার মধ্য দিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি পথ ধরে পালিয়ে যেতে হবে অনেক দূরে। তার মনে পড়ল মরা মায়ের কথা, মরা বাপের কথা, তার আফ্রিকা চলে-যাওয়া ভাইয়ের কথা। শন্-শন্-শন্ শব্দ করে একখানা ট্রাম তার কাছ দিয়ে চলে গেল। ট্রামের বিজলির ট্রলি, বিজলির লম্বা তারে ঘষতে-ঘষতে যেন তার শরীরে ঢুকে যেতে লাগল। তার আপন শরীরে পুরো ট্রামটাই ঢুকে যাচ্ছে বলে সে অনুভব করল, মনে হল, সে যেন কোনো মানুষ নয়, যেন এক ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তা।

অনেকক্ষণ ধরে সে চলছিল, হাঁপিয়ে পড়ছিল আর চলছিল। আন্দাজে, এক অজানা দিকে—যেদিকে কোনো একদিন তার ঘর ছিল। এখন তার মনে হচ্ছে, তার কোনো ঘর নেই। কিন্তু এ কথা জেনেও সে ওই দিকেই চলছিল, ঘরে যাবার তাগিদে অসহায় হয়ে সে পথ চলছিল কেবল। কিন্তু রোদ খুব চড়া, তখন আর সে রাস্তাও ভুলে গেল। শরীরে এমন শক্তি ছিল না যে, সে কোনো পথিকের কাছে রাস্তার খোঁজ নেয়; জেনে নেয় শহরের এটা কোন অঞ্চল। ধীরে-ধীরে তার কানের মধ্যে ট্রাম আর বাসের আওয়াজ বাড়তে লাগল, চোখের সামনে বাঁকা হয়ে যেতে লাগল দেয়াল। বাড়িঘর ভেঙে পড়তে লাগল। বিজলিবাতির থামগুলো ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যেতে লাগল কেমন। সে তার চোখের সামনে আঁধার আর পায়ের তলায় ভূমিকম্প অনুভব করল। আর হঠাৎই পড়ে গেল মাটিতে।

যখন তার হুঁশ ফিরে এল, তখন রাত হয়ে গেছে। এক ঠাণ্ডা আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সে চোখ খুলে দেখল, যে-জায়গায় সে পড়ে গিয়েছিল এখন পর্যন্ত সেই জায়গাতেই শুয়ে আছে। এটা ফুটপাথের এমন একটা মোড় যার পেছন দু'দিকে দুই দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। এক দেয়াল ফুটপাতের গায়ে-গায়ে সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। অপর দেয়াল চলে গেছে উত্তর থেকে পশ্চিম দিকে। দুই দেয়ালের জোড়ের মুখে সে শুয়েছিল। এ দুই দেয়াল প্রায় চার ফুট উঁচু আর এই দেয়ালগুলোর পেছনে ছিল বাঁশঝাড় আর ম্যাগনোলিয়া লতার ঝাড়, পেয়ারা আর জামগাছ। ওইসব গাছের পেছনে কী ছিল তা সে দেখতে পায়নি। অন্যদিকে, পশ্চিম দিকের দেয়ালের সামনে পঁচিশ-তিরিশ ফুট ছেড়ে দিয়েছিল এক পুরনো বাড়ির পেছনের অংশ। বাড়িটি তিনতলা; প্রতি তলার পেছন দিকে একটি জানালা আর ছ'টি বড়-বড় পাইপ। পেছন দিকের পাইপ আর পশ্চিম দিকের দেয়ালের মাঝখানে এক পঁচিশ-তিরিশ ফুট চওড়া

কানাগলি, তার তিনদিকে দেয়াল আর চতুর্থ দিকে পথ। দূরে কোথায় গির্জার ঘণ্টায় রাত তিনটে বাজল। সে ফুটপাতের উপর শুয়ে-শুয়ে কনুইয়ের ওপর জোর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। পথ একেবারে খালি। সামনের দোকানগুলো বন্ধ আর ফুটপাথের আঁধারে ছায়ায় কোথাও-কোথাও কমজোর বিজলিবাতি ঝলমল করছে। কিছুক্ষণের জন্য এই ঠাণ্ডা আঁধার তার খুব ভালো লাগল। কিছুক্ষণের জন্য সে নিজের চোখ দুটি বন্ধ করে ভাবল, সে বোধহয় কোনো দয়ার সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে।

কিন্তু এই অনুভূতি দিয়ে সে কেবল নিজেকেই মুহূর্তের জন্য ধোঁকা দিচ্ছিল, কারণ এখন তার খুব খিদে পেয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য আরামদায়ক ঠাণ্ডা উপভোগের পর সে অনুভব করল তার খুব খিদে পেয়েছে। তার অন্ত্রের অপারেশন হওয়ার পর থেকে তার খুব খিদে পায়। সে ভাবল ডাক্তার তার অন্ত্রের কাজ জাগিয়ে দিয়ে তার কোনো রকম উপকার করেননি। পেটের মধ্যে নাড়ি বিচিত্রভাবে পাক খাচ্ছিল আর অন্ত্রের একেবারে ভেতরে মোচড় দিচ্ছিল। এ সময়ে তার নাসিকা সভ্য নাগরিকের নাসিকার মতো কাজ করছিল না, বরং কোনো জংলি পশুর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মতো কাজ করছিল। তার নাকে আসছিল নানা বিচিত্র গন্ধ। সুগন্ধের এক ঐকতান তার চেতনায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আর আশ্চর্যের কথা এই যে, সে এই সুগন্ধ-ঐকতানের এক-এক সুরের আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব চিনে নিতে পারছিল। এই হল জামের গন্ধ, এটা হল পেয়ারার গন্ধ, এটা হল রজনীগন্ধার কলির গন্ধ, আর এ হল তেলেভাজা পুরীর গন্ধ। এটা হল পেঁয়াজ-রসুনে সাঁতলানো আলুর গন্ধ, এটা মুলোর গন্ধ, এটা টমেটোর গন্ধ, এটা হল কোনো পচা ফলের গন্ধ, এটা পেচ্ছাবের গন্ধ, এটা জলে ভেজা মাটির গন্ধ—বোধহয় নানা গন্ধের সমাবেশ থেকেই গন্ধগুলো আসছিল। এইসব গন্ধের প্রতিটি রূপ, ধরন, গতি আর উগ্রতা পর্যন্ত সে অনুভব করতে পারছিল। হঠাৎ তার সম্বিৎ হল, আর কী অসম্ভব খিদে তার সুপ্ত ঘ্রাণশক্তিকে কীভাবে সজাগ করে দিয়েছে তা ভেবে সে চমকে উঠল। কিন্তু এই কথা নিয়ে বেশি ভাবনা-চিন্তা না-করে যেদিক থেকে তেলেভাজা পুরী আর রসুনে-সাঁতলানো আলুর গন্ধ আসছিল সেইদিকে শরীরটাকে ধীরে-ধীরে আঁধার গলির ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কারণ নিজের শরীরে হাঁটবার সামর্থ্য সে একেবারেই পাচ্ছিল না। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল যে, সে গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন কোনো ধোপা তার পেটের অন্ত্রগুলোকে ধরে মোচড় দিচ্ছে। আবার তার নাসারন্ধ্রে পুরী আর আলুর খিদে-জাগানো গন্ধ এল। সে অধীর হয়ে আধ-বোজা চোখে নিজের প্রায় নির্জীব শরীরটাকে ঘেঁষে টেনে নিয়ে যেদিক থেকে আলুপুরীর গন্ধ আসছিল সে-দিকে যেতে চেষ্টা করল।

খানিকটা সময় পরে সে ওই স্থানে পৌছে দেখল, পশ্চিমের দেয়াল আর তার সামনের ইমারতের পেছন দিকের পাইপগুলোর মাঝখানে পঁচিশ-তিরিশ ফুট ব্যবধানে আবর্জনার একটা খুব বড় খোলা লোহার টব রয়েছে। এই টবটা পনেরো ফুট চওড়া আর তিরিশ ফুট লম্বা। রকমারি আবর্জনায় ভরা। পচাগলা ফলের খোসা, পাঁউরুটির ময়লা টুকরো, চায়ের পাতা, একটা পুরনো জ্যাকেট, বাচ্চাদের নোংরা ন্যাকড়া, ডিমের খোসা, খবরের কাগজের ছেঁড়া টুকরো, পত্রিকার ছেঁড়া পাতা, রুটির টুকরো, লোহার পাত, প্লাস্টিকের ভাঙা খেলনা, কড়াইশুঁটির খোসা, পুদিনার পাতা, কলার পাতায় কিছু

এঁটো পুরী আর আলুর তরকারি। পুরী আর আলুর তরকারি দেখে তার পেটের মধ্যে মোচড় দিল। কিছুক্ষণ সে তার অধীর হাতটাকে টেনে নিল, কিন্তু ওইসব সুগন্ধ যখন তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল তখন আগের পুরী আর তরকারির ক্ষিদে-জাগিয়ে-দেয়া সুগন্ধ তীব্র হয়ে উঠল। মনে হল ঐকতানের বিশেষ কোনো স্বর হঠাৎ খুব চড়া হয়ে বেজে উঠছে। হঠাৎই তার সংযমের শেষ প্রাচীর ভেঙে পড়ল। তখনি তার কম্পিত অধীর হাত কলার পাতা খাবলে নিল আর অমানুষিক ক্ষুধা অসহায় হয়ে ওই পুরীগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরী-তরকারি খেয়ে সে বারবার কলার পাতা চাটল। পাতাখানিকে চেটে এত সাফ করে দিল যে মনে হল তা গাছের নতুন পাতা। কলার পাতা চাটার পর সে নিজের আঙুল চাটল আর লম্বা-লম্বা নখের মধ্যে জমে থাকা আলুর তরকারি জিভের ডগা দিয়ে চেটে নিয়ে খেল। এতেও তার তৃপ্তি হল না। সে হাত বাড়িয়ে আবর্জনারাশি নেড়ে-চেড়ে তার থেকে পুদিনার পাতা বার করে খেল; মূলোর দুটি টুকরো আর আধখানা টমাটো মুখে দিয়ে তার রস খেল আরাম করে। আর সব যখন খাওয়া হয়ে গেল তখন তার সারা শরীরে নেমে এল আলস্যভরা ঘুমের ঢেউ। সে ওই টবের ধারেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আট-দশ দিন এভাবেই আলস্যভরা ঘুম আর অর্ধচেতনার মধ্যে কেটে গেল। সে ঘষতে-ঘষতে টবের ধারে যেত। যা খাবার পাওয়া যেত খেয়ে নিত সবই। আর যখন ক্ষিদে-জাগানো গন্ধের তৃপ্তিসাধন হয়ে যেত তখন তা ছাপিয়ে অন্য নোংরা গন্ধ উঠত। তখন সে ঘষতে-ঘষতে টব থেকে দূরে ফুটপাতের মোড়ে চলে গিয়ে পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

পনেরো-বিশ দিন পর ধীরে-ধীরে তার শরীরে বল ফিরে এল। ক্রমান্বয়ে সে নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল—জায়গাটা কেমন ভালো, এখানে রোদ নেই, আছে গাছের ছায়া, কখনো-কখনো পেছনের ইমারত থেকে কেউ জানালা খোলে আর কেউ হাত ঘুরিয়ে নিচের টবে রোজ আবর্জনা ফেলে। এই আবর্জনা ছিল তার অন্নদাতা, তাকে দিনেরাতে আহার জোগাত। এ ছিল তার জীবনরক্ষক। দিনে পথ মুখরিত হয়ে উঠত, খুলত দোকানপাট, লোকজন ঘুরে বেড়াত, বাচ্চারা পাখির মতো কিচকিচ করতে-করতে যেত পথ দিয়ে, স্ত্রীলোকেরা রঙিন ঘুড়ির মতো হেলেদুলে চলে যেত—কিন্তু সে ছিল অন্য এক জগৎ। এই জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এই জগতে কেউ ছিল না তার, আর সে-ও কারো ছিল না। এই দুনিয়ার প্রতি তার ছিল সীমাহীন ঘৃণা। এই দুনিয়া থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। শহরের গলি-বাজার-পথ তার কাছে হয়ে গিয়েছিল এক ধোঁয়াটে ছায়ায় তৈরি জগৎ। বাইরের মাঠ, ক্ষেত আর খোলা আকাশ তার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক ব্যর্থ কল্পনা। ঘর-সংসার, কাজ-কর্ম, জীবন, সমাজ-সংঘর্ষ—এসব অর্থহীন শব্দ পচে-গলে আবর্জনারাশিতে গিয়ে মিশেছিল। ওই দূরের জগৎ থেকে সে ফিরিয়ে নিয়েছিল তার মুখ। পনের ফুট লম্বা আর তিরিশ ফুট চওড়া ওই টব—ওই ছিল তার নিজের জগৎ।

ধীরে-ধীরে মাস আর বছর চলে গেল। সে ওই পথের মোড়ে বসে থাকত, স্মৃতিচিহ্নের মতো। কারোর সঙ্গে কথা বলত না, কাউকে সাহায্য করত না, কারোর

কাছে ভিক্ষে চাইত না। কিন্তু যদি কোনোদিন সে উঠে চলে যেত তো সেখানকার প্রতিটি ব্যক্তি এতে বিস্মিত হত, আর বোধহয় কিছুটা দুঃখিতও হত।

সবাই তাকে বলত জঞ্জাল বুড়ো। কারণ সবাই জানত যে, সে কেবল জঞ্জালের টব থেকেই আপন আহার্য সংগ্রহ করে। আর যেদিন তা থেকে কিছু মিলত না, সেদিন সে না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ত। বছরের পর বছর ধরে পথিকেরা আর ইরানি রেস্তোরাঁওয়ালারা তার এই স্বভাবের কথা জেনেছিল। তার জন্য যা কিছু দেবার তারা প্রায়ই জঞ্জাল-স্তূপে ফেলে দিত। আবার ইমারতের পেছনের জানালা দিয়ে ময়লা-আবর্জনার অতিরিক্ত অন্য খাবার জিনিসও প্রায়ই লোকে ফেলে দিত। আস্ত-আস্ত পুরী, কাবাব, অনেকটা তরকারি, মাংসের টুকরো, আধখাওয়া আম, চাটনি, কাবাবের টুকরো আর ক্ষীরমাখানো কলাপাতা। খাওয়া-পরার সব ভালোমন্দ জিনিস জঞ্জাল-বুড়ো এই টবের মধ্যেই পেয়ে যেত। কখনো-কখনো ছেঁড়া পাজামা, ফেলে দেয়া জাঙিয়া, ছেঁড়া জামা, প্লাস্টিকের গেলাস। এ কি শুধুই আবর্জনার টব? তার জন্যে এটা ছিল এক খোলা বাজার—সেখানে সে দিনে দুপুরে সকলের চোখের সামনে গালগল্প করত। যে-দোকানে যে-সওদা প্রয়োজন তা সে বিনা পয়সায় পেত। এই বাজারের সে ছিল একমাত্র মালিক। গোড়ায়-গোড়ায় কয়েকটি ক্ষুধার্ত বিড়াল আর ঘেয়ো কুকুর তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। কিন্তু মারমার করে সে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছিল। এখন সে এই টবের একমাত্র অধীশ্বর। সবাই মেনে নিয়েছিল তার অধিকার। মাসে একবার মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা আসত আর এই টব খালি করে দিয়ে চলে যেত। জঞ্জাল-বুড়ো তার বিরোধিতা করত না। কারণ তার জানা ছিল পরদিন থেকেই টব আবার ভর্তি হতে শুরু করবে। তার বিশ্বাস ছিল যে, এই দুনিয়ার মঙ্গল শেষ হয়ে যেতে পারে, প্রেম শেষ হয়ে যেতে পারে, বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আবর্জনা শেষ হয়ে যাবে না কোনোদিন। সারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বাঁচবার শেষ উপায় শিখে নিয়েছিল।

কিন্তু কথা এ নয় যে সে বাইরের দুনিয়ার খবর রাখত না। যখন শহরে চিনির দাম বেড়ে যেত তখন মাসের পর মাস আবর্জনার টবে মিঠাইয়ের টুকরোর চেহারা দেখা যেত না। আবার গমের দাম বেড়ে গেলে পাউরুটির একটি টুকরোও মিলত না। অন্যদিকে যখন সিগারেটের দাম বেড়ে যেত তখন এত ছোট সিগারেটের পোড়া টুকরো মিলত যে, তা ধরিয়ে ধূমপান করতে পারত না সে। যখন জমাদারেরা হরতাল করেছিল তখন দু'মাস ধরে টবের কোনো সাফাই হয়নি। আবার বকরিদের দিন যত মাংসের টুকরো মিলত তা অন্যদিন পাওয়া যেত না। দেয়ালীর দিন তো টবের আলাদা-আলাদা কোণে মিঠাইয়ের অনেক টুকরো পাওয়া যেত। বাইরের দুনিয়ার এমন কোনো ঘটনা ছিল না যার সন্ধান সে আবর্জনার টব থেকে না-পেত। গত মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে মেয়েদের গোপন ব্যাধি পর্যন্ত সবকিছুরই সন্ধান পেত সে। যদিও বাইরের দুনিয়ার প্রতি তার কোনো রুচি ছিল না।

পঁচিশ বছর ধরে সে এক আবর্জনার টবের ধারে বসে-বসে আপন জীবন কাটিয়ে দিল। দিনরাত, মাস-বছর তার মাথার উপর দিয়ে বায়ুতরঙ্গের মতো প্রবাহিত হয়ে গেল। তার মাথার চুল শুকিয়ে-শুকিয়ে ঝুলতে লাগল বটগাছের ঝুরির মতো। তার

কালো দাড়ি শাদা হয়ে গেল। গায়ের রঙ হল তামাটে। নোংরা চুল, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দুর্গন্ধভরা শরীর নিয়ে পথচারীর কাছে সে নিজেই যেন একটা জঞ্জাল-টবের মতো প্রতিভাত হত। সে ছিল এমন একটা টব যা কখনো-কখনো অঙ্গভঙ্গি করে, আর অন্যের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে আর জঞ্জাল-টবের সঙ্গে কথা বলে।

জঞ্জাল-বুড়োকে জঞ্জাল-টবের সঙ্গে কথা বলতে দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেত। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কী আছে? জঞ্জাল-বুড়ো লোকদের সঙ্গে কোনো কথা বলত না, কিন্তু এদের আশ্চর্য হতে দেখে মনে-মনে নিশ্চয় ভাবত যে, এই সংসারে কে আছে যে, অপরের সঙ্গে কথা বলে। বাস্তবে এই সংসারে যত কথাবার্তা হয় তা মানুষের মধ্যে হয় না, হয় কেবল নিজের জাতের সঙ্গে আর তাদের কোনো স্বার্থের মধ্যেই। দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা বাস্তবে এক প্রকার স্বগত-কথন মাত্র। এই দুনিয়া একটা খুব বড় আবর্জনার স্তূপ। এখানে সব লোক আপন আপন স্বার্থের কোনো টুকরো, ব্যক্তিগত লাভের কোনো খোসা বা মুনাফার কোনো ন্যাকড়া খাবলানোর জন্যে সব সময় তৈরি হয়ে আছে। যারা আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বা নীচ মনে করে তারা মনের পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন—সেখানে কত-না ময়লা-আবর্জনা রয়েছে। ওই আবর্জনা কেবল যমরাজই উঠিয়ে নিতে যেতে পারে।

এইভাবে দিনের পর দিন যায়, কত দেশ স্বাধীন হল, কত দেশ পরাধীন হল, কত সরকার এল, কত গেল, কিন্তু জঞ্জালের এই টব যেখানে ছিল সেখানেই আছে আর তার কিনারে জঞ্জাল-বুড়ো ওইভাবেই অর্ধচেতনভাবে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে, মনে-মনে বকবক করে, আর জঞ্জালের টব হাতড়ায়।

তারপর এক রাতে ওই আঁধার গলিতে যখন সে টব থেকে কয়েক ফুট দূরে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে ছেঁড়া কাপড় গায়ে কুঁজো হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তখন সে এক খুব তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গিয়ে জঞ্জাল-টবের দিকেই দৌড়ে গিয়েছিল। তারই ভেতর থেকে ওই তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

জঞ্জালের টবের কাছে গিয়ে সে টব হাতড়াল। তার হাত নরম-নরম মাংসপিণ্ডে ধাক্কা খেল। আরেকবার শুনতে পেল সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার। জঞ্জাল-বুড়ো দেখল টবের মধ্যে পাঁউরুটির টুকরো, চোষা হাড়, পুরনো জুতো, কাচের টুকরো, আমের খোসা, বাসি চাটনি আর টেড়াভাঙা বোতলের মাঝখানে এক নবজাত উলঙ্গ শিশু পড়ে আছে। হাত-পা নেড়ে নেড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে সে।

কিছুক্ষণ জঞ্জাল-বুড়ো আশ্চর্য হয়ে এই মানবকটিকে দেখল। বাচ্চাটি নিজের ছোট্ট বুকের সব জোর দিয়ে নিজের আগমন ঘোষণা করছিল। বুড়ো চুপচাপ হতভম্ব হয়ে চোখ বড়-বড় করে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। তারপর তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে পড়ে জঞ্জালের টব থেকে বাচ্চাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নিল।

কিন্তু বাচ্চা তার কোলে গিয়ে কোনোমতেই চুপ করে না। সে এ জীবনে সদ্য-সদ্য এসেছে, তারস্বরে ঘোষণা করছিল নিজের ক্ষুধা। সে এখনো বোঝেনি দারিদ্র্য কী হতে পারে, মমতা কতটা ভীরু হতে পারে, জীবন বিগড়ে যেতে পারে কীভাবে, জীবনকে কীভাবে ময়লা দুর্গন্ধময় হয়ে জঞ্জালের টবে ফেলে দেয়া যেতে পারে। এখন তার

কিছুই জানা নেই। এখন সে কেবল ক্ষুধার্ত। সে কেঁদে-কেঁদে নিজের পেটে হাত রাখছিল আর পা ছুড়ছিল।

জঞ্জাল-বুড়ো কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, সে কী করে এই বাচ্চাকে চুপ করাবে। তার কাছে কিছুই ছিল না—না দুধ, না চুষিকাঠি। তার তো কোনো ছড়াও জানা নেই। সে অস্থির হয়ে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চাপড়াতে শুরু করল আর খুব হতাশ হয়ে রাতের আঁধারে চারদিকে চেয়ে দেখল এ সময়ে বাচ্চার জন্যে দুধ কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন তার মাথায় কিছু এল না তখন সে তাড়াতাড়ি জঞ্জালের টব থেকে একটা আমের আঁটি বার করে নিয়ে তার প্রান্তভাগ বাচ্চার মুখে দিয়ে দিল।

আধ-খাওয়া আমের মিষ্টি-মিষ্টি রস যখন বাচ্চার মুখে যেতে থাকল তখন সে কাঁদতে-কাঁদতে চুপ করে গেল আর চুপ করতে-করতে জঞ্জাল-বুড়োর কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। আমের আঁটি পিছলে পড়ে গেল মাটিতে আর বাচ্চা তার কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল। আমের হলুদ-হলুদ রস তখন পর্যন্ত তার কোমল ঠোঁটের উপর লেগে ছিল। তার কচি-কচি হাত দিয়ে সে জঞ্জাল-বুড়োর বুড়ো আঙুল খুব জোরে ধরে রেখেছিল।

এ মুহূর্তের জন্য জঞ্জাল-বুড়োর মনে হল বাচ্চাটাকে এখানে ফেলে দিয়ে কোথায় পালিয়ে যায়। ধীরে-ধীরে জঞ্জাল-বুড়ো বাচ্চার হাত থেকে নিজের বুড়ো আঙুল ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বাচ্চা খুব জোরে ধরে রেখেছে তার হাত। জঞ্জাল-বুড়োর মনে হল, জীবন তাকে ফের ধরে ফেলেছে আর ধীরে-ধীরে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসছে। হঠাৎ তার দুলারির কথা মনে পড়ল। আর মনে পড়ল সেই বাচ্চার কথা, যে দুলারির গর্ভেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর হঠাৎই জঞ্জাল-বুড়ো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মনে হল, আজ সমুদ্র-জলে এত বুদ্‌বুদ্ নেই, যা তার চোখের জলে ছিল। গত পঁচিশ বছরে যত ময়লা আর নোংরা তার মনে জমে ছিল, আজ তা অশ্রুর তুফানে এক ধাক্কায় সাফ হয়ে গেল।

সারা রাত জঞ্জাল-বুড়ো ওই নবজাত শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে অস্থির ও অশান্ত হয়ে ফুটপাতে পায়চারি করল। যখন সকাল হল, সূর্যের আলো দেখা দিল তখন লোকে দেখল জঞ্জাল-বুড়ো আজ জঞ্জালের টবের কাছাকাছি বসে নেই, বরং পথের ধারে তৈরি-হওয়া ইমারতের নিচে ইঁট বইছে, আর এই ইমারতের কাছে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ফুলের নকশাওলা কাপড়ে শুয়ে এক ছোট্ট শিশু মুখে দুধের চুষিকাঠি নিয়ে হাসছে।

মিথুন

রাজেন্দ্র সিংহ বেদী

বাজার হয়ে উঠেছিল মন্দা অথবা কারবার ছোট। মনে হচ্ছিল পশ্চিম দিকে যেখানে সড়ক কিছুটা উপরে উঠে আকাশকে ছুঁয়েছে আর শেষ পর্যন্ত একেবারে নিচে নেমে গেছে, ওখানেই দুনিয়ার শেষ প্রান্ত, সেখান থেকে এক লাফ দিতে হবে, এই জীবনকে বাঁচাবার জন্যেই এবার প্রাণটা দিতে হবে।

সারাদিন মাথা চাপড়ানোর পর মগন টকলা (রকমারি চিজ বিক্রিঅলা) মাত্র দুটো জিনিস হাতে পেল। এক, ফ্লোরেনটিন আর দুই, জেমিনি রায়। ফ্লোরেনটিনের মূর্তি হয়তো কোনো মাথা-মোটা ফিল্ম প্রডিউসার ভাড়া করে নিতে যেতে পারে, কিন্তু জেমিনি রায়? কোনো আপসোস নেই, আজ সে ওটিকে লুকিয়ে রেখে দিলে কাল তার নাতি-পুতিরা তা থেকে কোটি টাকা উপার্জন করবে—যেমন পশ্চিমি দুনিয়ায় আজও কারো কাছ থেকে লিওনার্দোর স্কেচ বেরুলে আর্টের বাজারে তার নিলাম-মূল্য লাখ টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়। এই লাখ আর কোটি টাকার চিন্তায় মগন লালের দুচোখে বিজলি চমকায়। সে এ-কথা ভুলে গিয়েছিল যে, তার বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হয়ে গেছে। তাছাড়া তার মাথায় নেই একগাছি চুল, এমনকি তার বিয়েও হয়নি। সে-কারণে নাতি-পুতির কথাই ওঠে না। মগন করেই-বা কী? সে এক সাধারণ হিন্দু। সাধারণত তার চিন্তাগুলো এরকমই। তাছাড়া তার মন থেকে বেনে-ভাব যায়নি। কথায় সে 'পয়সা—এ-তো মায়া'—এ-কথা বলে তা দূরে ঠেলে দেয়, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে পয়সার প্রতি তার প্রচণ্ড আসক্তি। দুনিয়ায় যদি কেউ পয়সার পূজা করে তো সে হিন্দু। আজ তার সামনে দেওয়ালির দিনের আলোকিত পূজাপাত্র থেকে দুধ-জলে স্নাত, সিঁদুর-চর্চিত টাকা পাওয়া যাবে। দশহরার দিনে তার গাড়ি গাঁদাফুলের মালায় ভরে যাবে আর সব স্ত্রী-পুরুষ মিলে লক্ষ্মী-মন্দিরে পূজা দিতে যাবে। পয়সার জন্যে সে ইউসুফের মতো ভাই আর পদ্মিনীর মতো পত্নীকেও বিক্রি করে দিতে পারে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সিরাজা—ইবজ ব্যাটারির এজেন্ট। সিরাজার দোকান অশ্বথগাছের ঘেরের পেছনে। গরিব ল্যাৎপেতে হিন্দুরা সকালবেলায় অশ্বত্থের গোড়ায় জল-মেশানো দুধ ঢালত। দোকান আর সড়কের মাঝখানটা তাতে কাদা-কাদা হয়ে থাকত। দেশ-বিভাগের পরে হিন্দুস্থানে থেকে-যাওয়া সিরাজাকে গরিব হিন্দুদের এই প্রথাকে খাতির করে চলতে হত। হ্যাঁ, না-করলে তো সে হয়ে যেত সেইসব বর্ণশংকর

কুকুর, যেগুলো সারাদিন ঠ্যাঙ তুলে-তুলে ওই গাছের গায়ে পেচ্ছাব করত। এই গাছ সম্পর্কেই ভগবান বলেছেন, 'গাছের মধ্যে আমি হলাম অশ্বত্থ।' ওই কুকুর নিশ্চয়ই গতজন্মে ছিল মুসলমান—সাতচল্লিশ সনের দাঙ্গায় যে হিন্দুদের হাতে মারা গেছিল।

দেখা যেত সিরাজা হামেশা অশ্বত্থের ফল খাচ্ছে। তার কারণ মন্দা বাজার নয়, ক্ষুধাও নয়। সিরাজা সব সময় সেই জিনিস খেত যা বীর্যকে গাঢ় করে। হ্যাঁ, তার কাজই হল খাওয়া-দাওয়া আর ভোগ করা। মনের দিক থেকে সে ছিল ফালতু লড়ুয়ে যাযাবর—যারা হিন্দুস্থানে থেকে পাকিস্তানের কথা বলে। আবার পাকিস্তানে থাকে তো বলে, 'হে মোর প্রভু, আমায় মদিনায় ডেকে নাও।' তার কোনো-কিছুতেই আসক্তি নেই। মগন টকলা এ-নিয়ে কয়েকবার ভেবেওছে, সিরাজার আল্লা দুনিয়ায় খুব আরাম করেন। আর মগনের আছে এক ভগবান যিনি নিচের দুনিয়ার বদলে উপরের ত্রিকূট পর্বতের আশপাশে দরবার লাগান। বোধ হয় সিরাজা না-জেনে-শুনেই এক তান্ত্রিক হয়ে বসে আছে, যে বীর্যরক্ষার জন্য কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগায় আর উর্ধ্বগামী পথ তৈরি করে। সে গর্বের সঙ্গে নারীসমাজের মাঝে থাকে, কিন্তু কোনোভাবেই জীবনের পরম তত্ত্বকে (অমৃতরূপ বীর্যকে) স্খলিত হতে দেয় না। ইচ্ছামতো উপায়ে মোক্ষপ্রাপ্তিকারী, নারীকে কেবল এক মাধ্যমরূপে ব্যবহারকারী এই ব্যক্তি কখনো ভেবে দেখেছে কি এর ফলে ওই বেচারি নারীদের হাল কী হতে পারে? তাদের অতৃপ্ত রুদ্যমান অস্থির অবস্থায় রেখে কেউ কি এ-ভাবে মোক্ষে পৌঁছতে পারে? আর বীর্য পতিত না-হওয়াতে যে মোক্ষ, তাতে পুরুষের বা নারীর কোনো মুক্তি ঘটবে? স্বাতী নক্ষত্রের জল তো মোতি নয়। ঝিনুকও মোতি নয়। ঝরে-পড়া জল যখন ঝিনুকের মধ্যে মুখবন্ধ অবস্থায় থাকে, তখনই মোতির জন্ম হতে পারে।

রাত আসে দ্রুতগতিতে। বাইরের দুনিয়া আঁধার। তার সঙ্গে গুঁড়ি মেরে আসে আরো কিছু। রেশমওয়ালা বিলায়তিরাম, কাশ্মিরী বড়শাহ, এখানকার উড়পির চক্রপাণির দোকান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। হতে পারে, মাসের দ্বিতীয় শনিবার হবার ফলে চক্রপাণির সব ইডলি দোসা, সাম্বর, রওয়া কেসরি বিক্রি হয়ে গেছে। কেবল খোলা ছিল সিরাজার দোকান। কে জানে সে কোন মতলবে ছিল। বোধহয় এর জন্যে যে ব্যাটারির প্রয়োজন তা তো রাতেই হয়। কিন্তু ঝুটমুট সে সকালেই দোকান খুলে ফেলত—সকাল তো রাতেরই অংশ—তার শেষ অংশ, তা না-হলে সকাল কোথায়-বা কার। বোধহয় সিরাজা ট্যুরিস্ট এজেন্ট মাইকেলের অপেক্ষায় ছিল; ওরা দু'জনে মিলে আগামী কোনোদিনে আগ্রা বা খাজুরাহোর ভ্রমণসূচি তৈরি করে নেবে, আর তাতে কিছু পয়সাও উপায় হবে। না, সিরাজা পয়সার পেছনে দৌড়ত না। সে দৌড়াত পশ্চিমি মেয়েদের পেছনে। অনেক বিয়ে আর তালাকের কারণে ওইসব মেয়েরা ছিল অতৃপ্ত। এখানে এসে মমতাজের প্রেম নিয়ে এখানে-ওখানে কোনো শাহজাহান-চেহারাওয়ালা মরদের ওপর ভাগ্য পরীক্ষা করত। খাজুরাহোর মিথুনমূর্তিকে জীবন্ত করে তুলতে চাইত।

তখনই সিরাজার আওয়াজ মগনলালকে চমকে দিল, 'হ্যালো সুইটি পাই।'

এমনিতে সিরাজা প্রায় অশিক্ষিত। কিন্তু ট্যুরিস্টের সঙ্গে থেকে থেকে সে এইসব ইংরেজি শব্দ শিখে ফেলেছিল। তার আওয়াজে মগন বুঝে নিল যে কীর্তি এসে গেছে।

সত্যি সত্যিই কীর্তি এসেছিল। বেঁটে, আঁটসাঁট বাঁধুনি, গভীর ভাঁজযুক্ত দেহ, বিষণ্ন চেহারার যুবতী। তার রঙ ছিল পাকা। জাম রঙের শাড়ি পরত কীর্তি। সে এলে মনে হল আঁধারের কোনো টুকরো সাকার হয়ে সামনে এসেছে। কীর্তি সচরাচর রাতেই আসত। সে নিজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইত। সিরাজা দাঁড়িয়েছিল তার দোকানের সামনে। কীর্তি প্রায়ই তার দিকে না-তাকিয়ে কথা না-বলে চলে যেত। তা সত্ত্বেও সিটি বাজাত সিরাজা।

কিন্তু কীর্তি কথাই-বা বলত কোথায়। এর সঙ্গে, ওর সঙ্গে, তার সঙ্গে—কারুর সঙ্গেই না। কথা বলার জন্যে সে এমনি সওয়াল গড়েপিটে নিত্য যার জবাব হত 'হ্যাঁ' বা 'না'। কেবল উপর থেকে নিচে অথবা ডাইনে থেকে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে কথা সেরে নিত কীর্তি। তাকে সিরাজার বিরক্ত করা মগনলালের পুরোপুরি অপছন্দ ছিল। সিরাজা কয়েকবার মগনকে বলেছিল—

'ইয়ার, তুমি প্রেমের গোলকধাঁধায় পড়ে যাওনি তো? যুবতী মেয়েটাকে টেনে নাও। যদি বেশি এদিক-ওদিক কর তো কবুতরের মতো মেয়েটি উড়ে যাবে।'

কিন্তু মগন তাকে ধমকে দিয়েছে।

আসলে মগন টকলার ধান্দা ছিল বড় ঝামেলার। কীর্তি কাঠের কাজ বা মূর্তি তৈরি করে বিক্রির জন্য তার কাছে নিয়ে এলে মগন লাল তাতে অনেক খুঁত বের করত। কখনো বলত, এই ধরনের জিনিসের চাহিদা আজকাল নেই। আবার কখনো বলত, শিল্পকলার কষ্টিপাথরের বিচারে এ কাজ নিখুঁত হয়নি। কীর্তি মুখ আরো নামিয়ে নিত। যদিও এইসব কথায় মগন লালের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে একশ' টাকার জিনিস পাঁচ-দশ টাকায় কীর্তি দিয়ে যায় আর তা রেখে দিয়ে সে একশ টাকায় বেচে।

কোনো আর্ট স্কুলে কীর্তি এই কাজ শেখেনি। তার বাপ নারায়ণ ছিল শিল্পী। ভাউ দাজী আর জেমস বর্গেস প্রভৃতির সঙ্গে সে নেপাল আর হিন্দুস্থানের নানান জায়গায় শিল্প-উত্তরাধিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। সেসব শিল্পকীর্তি এখন লন্ডনের যাদুঘর, নিউইয়র্ক আর শিকাগোর অ্যান্টিক-দোকানগুলোকে অলঙ্কৃত করছে। প্রতিবছর আমাদের মন্দির আর মূর্তিঘরের শত-শত মূর্তি গায়েব হয়ে যেত আর হাজার-হাজার মাইল দূরে কিউরিও প্রভৃতির দোকানে দেখা যেত। বিরতিহীন সফরে বিরক্ত হয়ে নারায়ণ ফিরে এসে ঘরে বসেই শিল্পকর্ম নির্মাণ শুরু করে দিল এক সময়। কীর্তি গভীর মনোযোগে তার কাজ দেখত আর কাজের মাঝে হাতে খোদাইযন্ত্র এগিয়ে দিয়ে 'রাফ ওয়ার্কে' সাহায্য করত। ঘরে বসে গিয়ে নারায়ণ ভুলেই গিয়েছিল যে, লুপ্ত প্রাচীন শৈলীর শিল্পকর্ম বেশি দামে বিক্রি হয় আর সেসবের মূল্য দু'গুণ-চৌগুণ নয়, শতগুণ পাওয়া যায়। হয়তো সে তা জানত কিন্তু নারায়ণ ছিল সেই দলের মানুষ যারা পয়সার আশু প্রয়োজনই কেবল বুঝতে পারে, তাকে জীবনের প্রসারিত পটে দেখতে পারে না। সে শিল্পকর্ম তৈরি করে কষ্টে-সৃষ্টে রুটির পয়সা উপার্জন করত। শেষে একদিন রুটির পয়সা জোগাড় করতে-করতেই মৃত্যু হল নারায়ণের। তখন সে জগদম্বার মূর্তি বানাচ্ছিল। সে হঠাৎ ভুল করে তার খোদাইযন্ত্র দিয়ে নিজের হাতে আঘাত করায় তার ধনুষ্টঙ্কার হয়ে যায়। সে মারা যায় কাছেরই সামরিক হাসপাতালে। লোকেরা কানাকানি করত এই বলে

যে সে নাকি কুকুরের মতো মরেছে। এইরকম মৃত্যু তার হবে নাই-বা কেন? সে যখন দেবীমূর্তি বানিয়েছে তখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দেবীর স্তনযুগল, নিতম্ব আর জঙ্ঘার ওপর-নিচে আটকে থেকেছে। ছোট মূর্তিতে স্তনযুগল শূন্যে ঘূর্ণায়মান লাট্টুর মতো দেখায়, কিন্তু বড় মূর্তিতে পা আর স্তনযুগল এক রকম ছোট ঘড়ার মতো দেখায়। আসল কথা, দুধের বড়-বড় বাটি যেন বুকের পরে রাখা হয়েছে, আর হস্তিনীর মাথার মতো নিতম্ব, যার নিচে একটি শুঁড়ের বদলে দুটি শুঁড় বেরিয়েছে। সে দুর্গামূর্তি বানাচ্ছিল। দুর্গা বড় জাঁকজমকভরা দেবী। এইরকম দেবীর মূর্তি যে বানাতে যাবে সে কুকুরের মতো মরবে না তো কি আমার-আপনার মতো মরবে?

'কী এনেছ?' মগন টকলা কীর্তিকে জিজ্ঞেস করল। কীর্তি শাড়ির আঁচল থেকে 'কাঠের কাজ' বের করে মগনের সামনে টেবিলের 'রোল টপে'র উপর ধীরে-ধীরে রাখল। উপরের ল্যাম্পের আলো ওখানেই কেন্দ্রীভূত ছিল বলে রাখল। কাজটা দেখার আগে মগন কীর্তির দিকে এক পুরনো কাজ-করা চেয়ার এগিয়ে দিল, কিন্তু কীর্তি আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার মা কেমন আছে?'

কীর্তি কোনো জবাব দিল না। সে একবার পেছন ফিরে যেখানে সড়ক নিচের দিকে নেমে গেছে, সেদিকে তাকাল। তারপর যখন মগনের দিকে ফিরে দাঁড়াল তখনও তার চোখদুটি আনত।

কীর্তির মা তখন সামরিক হাসপাতালে। সেখানেই তার বাপ নারায়ণ মারা গিয়েছিল। বুড়ির 'কিডনি'র রোগ ছিল। তার পেট ছেঁদা করে নল লাগিয়ে একটা বোতল বেঁধে দেয়া হয়েছিল যাতে করে মলমূত্র নিচে যাবার বদলে ওপরের বোতলে চলে যায়। বোতল কোনো কারণে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন অন্য বোতলের জন্য পয়সা চাই। যদি সে মগনকে এ-কথা বলে দিত তো মগন অন্যভাবে কথা শুরু করত, কিন্তু ওই কাঠের কাজ দেখে সে চমকিত হয়ে গেল।

'আবার ওই জিনিস?' সে বলল—'আমি তোমাকে কয়েকবার বলেছি আজকাল এইসব জিনিস কেউ পছন্দ করে না... এই শায়িত বিষ্ণু, ওপরে শিষনাগ, আর তাঁর পদসেবারত লক্ষ্মী... ।'

কীর্তি বড়-বড় চোখে মগনের দিকে তাকাল—ওই দৃষ্টিতে কৌতূহলী প্রশ্ন—'তবে কী বানাব?'

'ওই সব যা আজকাল হচ্ছে।'

'আজকাল কী হচ্ছে?' কীর্তি শেষ পর্যন্ত মুখ খোলে। তার কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যায় না, যেমন ক্যানারি পাখি ঠোঁট বাঁকিয়ে ডাকে কিন্তু তার আওয়াজ অস্ফুট।

মগন কথা বলার রাস্তা খুঁজে পেয়ে বলল, 'আর কিছু না হয় তো গান্ধী বানাও... নেহরু বানাও... ।' ফের তার যেন কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে এ-ভাব কাটিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কোনো ন্যুড।'

'ন্যুড?'

'হ্যাঁ,... আজকাল লোকে ন্যুড পছন্দ করে।'

কীর্তি চুপ করে গেল। কুমারী বলে সে সংকুচিত হতে পারত, লজ্জা পেতে পারত, কিন্তু এইসব লজ্জা-সংকোচ তার মতো মেয়ের কাছে নেহায়েত বিলাসিতা। তার একমাত্র চিন্তা মগন ওই উডওয়ার্ক কিনবে কি-না, পয়সা দেবে কি-না? কিছুটা ভেবেচিন্তে সে বলল—

'আমি ঐ মূর্তি বানাই না...'

'তফাত কী এদের মধ্যে?' মগন টকলা বলল—'দেবীও তো নারী... তুমি ওই মূর্তিই বানাও, কিন্তু ভগবানের দোহাই, কোনো দেবমালা ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়ো না... এইসব কারণেই তোমার বাবা ওভাবে মৃত্যুবরণ করেছে... স্বর্গবাসী হয়েছে...।'

কীর্তি নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকাল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোনো এক বিপদাশঙ্কায় তার সারা শরীর কাঁপছিল। সেই বিপদের কথা সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না। সে চেয়ারে বসেনি। সেটাকে ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেদিক থেকে তার শরীরের সুন্দর রেখাগুলো দেখাচ্ছিল এক আকর্ষণীয় ছবির মতো। এ কেমন শিল্প যা উপরের নয়, নিচের নারায়ণ বানিয়েছিলেন। মগনলালের হৃদয়ে তখন পছন্দ আর অপছন্দের দ্বন্দ্ব। সে জানত-না যে, সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির হৃদয়ে বশ আর বিবশের মধ্যে আপসে লড়াই চলছে। কীর্তির মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছিল। থুতু গিলে নেবার চেষ্টা করে কীর্তি বলল,

'আমি?...আমার কাছে তো মডেল নেই...'

'মডেল?' মগন তার কাছে এগিয়ে আসে।

'শত-শত পাওয়া যায় ... আজ কোনো যুবতী সুন্দরী মেয়েকে পয়সার ঝলক দেখাও তো সে একদম...'

কীর্তি কিছু বলেনি কিন্তু মগন শুনল, 'পয়সা...' মগন নিজেই বলল—

'পয়সা খরচ করলে তবে তো পয়সা উপায় করবে...'

এই কথা কীর্তিকে আরো বিষণ্ন করে তুলল। তার আত্মা জীবনের শক্ত চোয়ালের মধ্যে পড়ে ধড়ফড় করতে লাগল। তার চোখদুটি অশ্রুতে ভিজে উঠল। মেয়েদের এমনি দশা হয় যা দেখে পুরুষের অন্তরে পিতা আর স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। সারকথা এই যে, মগনের ইচ্ছে হচ্ছিল হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বুকে নিয়ে নেয়—

'আমার প্রাণের পুতুল, তুমি চিন্তা করো না... আমি তো আছি।'

কিন্তু কীর্তি তাকে ধাক্কা দিল। বিব্রত হয়ে গেল মগন। সে এমন ভাব দেখাল যে, কিছুই ঘটেনি। তরুপের তাস তো তারই হাতে। টেবিলের 'রোলটপ' থেকে সে ওই 'উড-ওয়ার্ক'টি তুলে নিল আর কীর্তির দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বলল—

'আমার এ-জিনিসের দরকার নেই।'

কীর্তিও কিছু-একটা ভেবে নিয়েছিল। সে প্রথমে নিচের দিকে দেখল তারপর সহসা মাথা তুলে বলল—

'আসছে-বার ন্যুডই নিয়ে আসব। এখন তুমি এটাই নিয়ে নাও'...

'শর্ত রইল।' মগন মুচকি হেসে বলল।

কীর্তির মাথা নিচের দিকে নোয়ানো। মগন টকলা ভেবেছিল যে, কীর্তি হেসে উঠবে, কিন্তু সে আরো কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল। মগন 'রোলটপ' তুলে টেবিলের ভেতর থেকে একটা দশ টাকার চকচকে নোট বের করে কীর্তির দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'নাও...'

'দশ টাকা...' কীর্তি বলল।

'হাঁ, তুমি বলছ তাই, আমার কাছে এ মূর্তি বেকার। আমি আর দিতে পারব না...'

'এতে তো...' কীর্তি তার বাক্য শেষ করতে পারল না। তার ভেতরে কথা বলার শক্তি, শব্দ সব রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অভিপ্রায় ছিল স্পষ্ট। মগন বুঝে নিল।

'এতে তো ওষুধের বোতলও আসবে না... ওষুধের খরচ পুরো হবে না... রুটিও চলবে না...।' এই ধরনের কথাই সব অসহায় আর গরিবরা বলে থাকে। তাদের সব কথাই বৃথা। মগন কীর্তির দিকে তাকিয়ে বলল—

'আমাকে খুশি করে দাও, আমি তোমায় ভালো পয়সা দেব'...

আর এই কথা বলতে গিয়ে সে দু'আঙুল দিয়ে বৃত্ত বানাল। সে চোখ মারল যেমন করে ডোমেরা সজ্জিতা বেশ্যাদের তারিফ করে চোখ মারে।

কীর্তি দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে বাইরে চলে এল। ফেরার সময়ে সর্বদাই কীর্তি উল্টোদিকের পথে যায় যদিও এতে তাকে দেড় মাইল পথ ঘুরে যেতে হয়। সে চাইত না সিরাজার সঙ্গে তার দেখা হোক, কিন্তু আজ সেদিক দিয়েই সে গেল যেন তাতে তার বিপদাশঙ্কা সমাধানের অভিপ্রায় বলবতী হয়। এর মধ্যে মাইকেল চলে এসেছে আর সিরাজার সঙ্গে মিলে কিছু খাচ্ছে। এই সময় কীর্তি মুখ উপরে তুলে নাক ফুলিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সিরাজা কী একটা কথা বলল যা মগন শুনতে পেল না। কীর্তির মনে এক ধরনের বিদ্রোহের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে সেইসব দুঃখ-পীড়িতদেরই একজন—যাকে দুশমন পরিবৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে। বোধহয় দুশমন থেকে কোনো উপকার আসতে পারে—অথবা হয়তো-বা নারীপ্রকৃতির এটাই বিশেষত্ব যে, নিজের পেছনে সে এমন একটা পুরুষকে লাগিয়ে রাখবে যার সঙ্গে তার কোনো লেন-দেন নেই, তবু সে তা করবে কেবল এ-কারণেই যে, ওই পুরুষ তাকে দেখে একবার 'সিটি' বাজাবে আর সে নিজের বুকে হাত রেখে ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে।

সিরাজা নিশ্চয় কোনো 'আফ্রোডিজিয়াক্' খাচ্ছিল। হতে পারে মাইকেল তার জন্য ওটি নিয়ে এসেছে। হয়তো ওরা দু'জনে মিলে মগন টকলার কাছে এসে তার সঙ্গে ছদ্মব্যঙ্গে কথার ঘাত-প্রতিঘাত চালাত, কিন্তু ঠিক সেই সময় মগন বন্ধ করে নিল দোকান। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে কীর্তির সেই উড-ওয়ার্কটিকে দেখল। শিল্পীকর্মটি বেশ উঁচু দরের। শেষনাগের নিম্নাংশ খুব সুন্দর, কিন্তু তার উপরাংশের চিত্রিত দেহচর্মে কীর্তি উল্কির ছাপ ও রঙে ভরে দিয়েছিল। বিষ্ণুমূর্তিটির মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটে রয়েছে যা যে কোনো রমণী আস্থাবান পুরুষের মধ্যে দেখতে চায়। হ্যাঁ লক্ষ্মী হেলে পড়েছিল, তার শরীরের রেখাগুলোও স্পষ্ট ছিল না। বোধহয় কীর্তি লক্ষ্মীর আর কোনো রূপকে জানত না, যদিও তাকে রুচিগ্রাহ্য রূপে বানানো খুবই সোজা। যখন রমণী পা টেপবার জন্য ঝুঁকে পড়ে তখন তার হাতের বাজু দেখা যায়, শরীর থেকে তা আলাদা হয়ে আসে; ফলে তা রমণীকে তার বিশেষত্ব নিয়ে স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলে। আবার পাশের দিকে উপবিষ্টা উপরাসীন রমণীকে নিম্নাসীনার চেয়ে কত তফাত বলে মনে হয়। পুরুষের দৃষ্টিতে নারীশরীর কতই-না উঁচুনিচু রেখাময়। আবার এ-কথাও বলা যায়, কীর্তি নিজে রমণী বলেই হয়তো রমণীর তুলনায় সে পুরুষের প্রতি বেশি আগ্রহী,

সে-কারণেই লক্ষ্মীমূর্তি নির্মাণে তার এই ত্রুটি। রমণী আপন সৌন্দর্যের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আত্মরতিতে ডুবে থাকে আর যখন তার এই আত্মরতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন কোনো পুরুষের সহায়তায় তা থেকে মুক্তি পায়।

কীর্তির ঐ 'উড-ওয়ার্ক' মগন এক হাতে ধরে অন্য হাতে ছুরি নিয়ে তার উপর 'সিদ্ধম নমঃ' অক্ষর খোদাই করে পেছনের ঘরে চলে গেল। সেখানে জমি কাঁচা মাটির। মাটি খুঁড়ে সে তার মধ্যে 'উড-ওয়ার্ক'টিকে রাখল। মাটির ভেতর থেকে আরেকটি মূর্তি বের করল সে, সেটাও কীর্তির বানানো। গর্তের মধ্যে মাটি দিয়ে তার মধ্যে খয়েরের জল ছিটিয়ে দিল। পুরনো মূর্তির ধুলো ঝেড়ে সে দেখতে পেল তাতে বড়-বড় ফাটা-দাগ হয়ে গেছে আর তা কয়েক শতাব্দীর পুরনো বলে মনে হচ্ছে। পরের দিন যখন সেটিকে নিয়ে মগন ট্যুরিস্টদের কাছে গেল তখন তারা খুশি হল খুব। মগন তাদের জানাল যে এই মূর্তির উল্লেখ কালিদাসের রঘুবংশে আছে। রঘু কোঙ্কণ দেশে ত্রিকূট নামে এক শহর স্থাপন করেছিলেন, সেখান থেকে ওই মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এ-ধরনের কিছু মূর্তি মহীশূরের চামরাজা ওয়াডিয়ারের কাছে আছে। আর কিছু তার কাছে। এইভাবে মগন টকলা ঐ মূর্তিটিকে সাড়ে পাঁচশ' টাকায় বেচে দিল। এটার জন্যে সে কীর্তিকে দিয়েছিল মাত্র পাঁচটি টাকা।

এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে কীর্তি 'ন্যুড' নিয়ে এল। তার মুখে আগের মতোই চিন্তার ছাপ। ওর মা অসুস্থ। সে নিজেও অসুস্থ বোধ করছিল। ওর প্রায় নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। সে খকখক করে কাশছিল আর বারবার নিজের গলা ধরছিল। তুলোর পট্টি গলায় রেখে তা এক ফাটা-ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বেঁধেছিল সে।

কীর্তি অন্যান্য দিনের মতোই মগন টকলার সামনে মূর্তিটি রেখে দিল। এই মূর্তি সে কাঠ দিয়ে নয়, পাথর দিয়ে বানিয়েছিল। আশা আর আশঙ্কার সঙ্গে কীর্তি মগন টকলার দিকে তাকিয়েছিল। মগন যদি অপছন্দ করে তবে তা অমার্জনীয় মিথ্যা কথা হবে। এ-কারণে মগন কেবল তা পছন্দই করেনি, পরন্তু প্রাণভরে তারিফ করেছিল। নিন্দা করেছিল এইমাত্র যে মূর্তিটি খুব ছোট হয়েছে। তার আফসোস এই যে, মূর্তিটি যদি প্রমাণ মানুষের উচ্চতাবিশিষ্ট হতো তবে কেবল কীর্তির নয়, মগনেরও অনেক উপকার হতো।

মগন যক্ষীমূর্তি হাতে নিয়ে সযত্নে দেখছিল। কীর্তি সত্যিসত্যি 'ন্যুড' বানাতে পারেনি। মূর্তির মুখের উপর ছিল ভেজা কাপড়। আশ্চর্য ওই কাপড় থেকে এখনো পর্যন্ত জলবিন্দু ঝরে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। সেই জলবিন্দুর কিছুটা মুখের সঙ্গে লেগে আছে, কিছুটা অন্যান্য জায়গায়। উপর থেকে মুখ ঢাকার চেষ্টায় ওই রমণীর দেহ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মূর্তি থেকে নজর তুলে নিয়ে মগন টকলা কীর্তির দিকে তাকাতেই হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—'বাহ্'। কীর্তি লজ্জিত হয়ে নিজের জামদানি শাড়িটিকে কিছুটা সামনে টানল, কিছুটা দিয়ে পেছন দিকে ঢাকতে লাগল। কিন্তু মগন ঠিক বুঝে নিয়েছিল যে, আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ওই মূর্তি সে বানিয়েছে। এতবার তাকে কাপড় ভিজিয়ে নিজের মুখের উপর রাখতে হয়েছে যার ফলে তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে আর সে এখন পর্যন্ত কাশছে। এ কেবল পয়সার কথা নয়। নারীর মধ্যে

আত্মপ্রদর্শন আর আত্মসমর্পণের ভাবও তো আছে। মগন সবকিছু বুঝে ফেলেছিল। কিন্তু জেনে-বুঝে না-জানার ভান করে তাকে শুধিয়ে নিল—

'মা কেমন আছে?'

এ-কথায় খুব চটে গিয়েছিল কীর্তি। তার কাশির দমক এসেছিল আর নিজেকে সামলাতে তার লেগেছিল বেশ-খানিকটা সময়। মগন ঘাবড়ে গিয়েছিল, আর লজ্জিতও হয়েছিল। তারপর মাথা হেলিয়ে যে প্রশ্ন সে করেছিল তা-ও জরুরি ছিল না—

'তা হলে তুমি মডেল পেয়েছিলে?'

কীর্তি প্রথমে দৃষ্টি নত করেছিল, তারপর দোকানের বাইরে তাকিয়ে সেই দিকে দেখেছিল যেদিকে সড়ক আকাশ ছুঁতে গিয়ে হঠাৎ নিচে নেমে গেয়েছে। মগন চেয়েছিল কীর্তির দুর্বলতা ধরে ফেলে আর প্রাপ্য তারিফ তাকে দেয়, আর বোধহয় দিতে চেয়েছিলও। কিন্তু মগন ভাবল এতে মূর্তির দাম বেড়ে যাবে। সে মনে-মনে স্থির করেছিল এবার সে কীর্তিকে একশ' টাকা দেবে। ওষুধের বোতল আর বাকি জিনিসপত্রের দাম একশ' টাকা না-হলেও সে একশ' টাকাই দেবে। ভেতরে-ভেতরে সে ভয় পাচ্ছিল, কীর্তি আরো বেশি টাকা-না চায়।

'কী দাম দেব এর জন্য?' সে হাল্কাভাবে প্রশ্ন করল।

কীর্তি চকিত নজরে তার দিকে দেখল আর বলল, 'এবার আমি পঞ্চাশ টাকা নেব।'

'পঞ্চাশ?'

'হাঁ, এক পাই কম না...'

মগন হতাশভাবে 'রোলটপ' তুলল আর চল্লিশ টাকা বের করে কীর্তির সামনে রাখল আর বলল—

'যা তুমি বল, কিন্তু এখন আমার কাছে চল্লিশ টাকাই আছে...দশ টাকা পরে নিয়ে যেয়ো...'

কীর্তি টাকা হাতে নিল আর বলল—

'আচ্ছা।'

সে চলে যাচ্ছিল মগন তাকে থামাল—'শোনো।'

কীর্তি চলার মাঝে থেমে গিয়ে তার দিকে—'আমাকে সাহায্য কর' এই ঢঙে—তাকিয়ে দেখল। কীর্তির চেহারায় বিষণ্ণতা, কিন্তু তা যখন ছড়িয়ে যাবার বদলে স্থির হয়ে গেল ঠিক তখনই মগন টকলা শুধাল—'এই টাকায় তোমার কাজ হয়ে যাবে তো?'

কীর্তি মাথা হেলিয়ে হাত ছড়িয়ে দিয়েছিল, যার অর্থ 'আর কী করা যায়?'—সে মুখে বলল, 'মা'র অপারেশন এসে গেল, একশ' টাকা লাগবে।'

কিছুক্ষণ পর কীর্তি ফের বলল, 'আমি তো বলেছি'; একটু থেমে বলল, 'মা যত শীঘ্র মরে যায় ততই ভালো।' সেখানে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল কীর্তি।

শেষে কীর্তি নিজেই বলে উঠল, 'এইভাবে ছুটে বেড়ানোর চেয়ে মরণও ভালো।'

যতক্ষণ মগন চোখ খুলে না-তাকায় ততক্ষণ কীর্তিকে তার আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ের বদলে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের ভরন্ত রমণী বলে মনে হয়, সে জীবনের প্রত্যেক আঘাত নিজের ওপরে নিয়ে তাকে ব্যর্থ করে ফেলে দিচ্ছে।

'একটা কথা বলি।' টকলা কাছে এসে বলল, 'তুমি মিথুন বানাও... অপারেশনের সব খরচ আমি দেব।'

'মিথুন?' কীর্তি বলে কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ। ওর খুব চাহিদা আছে। ট্যুরিস্টরা ওগুলোর জন্যে পাগল হয়ে ওঠে।'

'কিন্তু...'

'বুঝতে পারছি।' মগন মাথা হেলিয়ে বলল।

'তুমি না-জানো তো একবার খাজুরাহো চলে গিয়ে দেখে এস। আমি তার জন্য তোমাকে রাহা-খরচ নিতে রাজি আছি...'

'তুমি!' কীর্তি ঘৃণার সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরে বলল, 'তুমি তো বলেছ, তোমার কাছে আর পয়সা নেই...'

মগন ঝটপট মিথ্যা তৈরি করে নিল—

'আমার কাছে সত্যি পয়সা নেই', সে বলল, 'আমি দোকানের ভাড়া দেয়ার জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রেখেছিলাম।'

সে ফের টাকা দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কীর্তি আপন অহংকারে তা না-নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। মগন টকলা ঘুরে দাঁড়িয়ে যক্ষী-মূর্তিটি দেখল। ছোট হাতুড়ি দিয়ে তার নাক ভেঙে দিল, ঠ্যাং ভেঙে দিল আর মূর্তির শিরের আভরণের উপর লঘুভাবে এমন করে আঘাত করল যাতে কিছু অংশ ভেঙে পড়ে যায়। তারপর ভেতরের ঘরে গিয়ে সে মূর্তিটিকে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে লবণের অ্যাসিড-জলে ডুবিয়ে রাখল। ফলে ধোঁয়া উড়ল খানিকটা। মগন দড়ি ধরে টেনে যক্ষীকে বার করে জলে ডুবোতে লাগল। তারপর যখন জল থেকে তাকে তুলে নিল তখন যক্ষীর সাজ-আভরণ মলিন হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে কোথাও হঠাৎ দেখা দিয়েছে গর্ত। এখন এই মূর্তি হাজার টাকায় বিক্রির জন্য তৈরি।

এবার কীর্তি যে মূর্তি নিয়ে এল তা মিথুন-মূর্তি। তা ছিল প্রমাণ মানুষের উচ্চতাবিশিষ্ট। মূর্তি একটি বস্তায় বাঁধা অবস্থায় ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে সে নিয়ে এল। কয়েকজন মজুর তা মগন টকলার দোকানে তুলে দিয়ে রেখে মজুরি নিয়ে চলে।

কীর্তি আর নিজেকে একা পেয়ে এক নিঃশ্বাসে মগন টকলা বস্তার দড়িদড়া কেটে ফেলল। কৌতূহলের সঙ্গে খুলে নিল মূর্তির আবরণ। এখন মূর্তিটি তার সামনে। 'পারফেক্ট'—মগন মূর্তিকে দেখল, শুকিয়ে গেল তার গলা। সে ভেবেছিল যে কীর্তি তাকে নিজের সামনে ওই শিল্পমূর্তিকে দেখতে দেবে না। কিন্তু কীর্তি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার সামনে, কোনোরকম আবেগ ছাড়াই শিল্পের নারীমূর্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল, আর পুরুষমূর্তি আত্মবিস্মৃত হয়ে তার দুই কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে রইল—মগন টকলা এই যুগলমূর্তিকে যত্নের সঙ্গে দেখল—সে বোধহয় নিভৃত অবসরে মূর্তিটাকে আরো ভালো করে দেখতে চাইছিল।

মগন দ্রুত জিজ্ঞেস করল।

'অপারেশনের জন্যে কত টাকা চাই?'

'অপারেশনের জন্য নয়—নিজের জন্য।'

'নিজের জন্যে? ... মা...'

'কয়েক সপ্তাহ হল মারা গেছেন।'

মগন তার নিজের চেহারায় দুঃখ আর আফসোসের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কীর্তি তা চায়নি। তার দুই ঠোঁট চেপে বসেছিল। ওই রকমই বিষণ্ণভাবে সে বলেছিল, 'আমি এর জন্যে হাজার টাকা নেব...'

মগন চকিত হয়ে গিয়েছিল। তার কথায় ছিল তোতলামি—'এর জন্যে কেউ হাজার টাকা দিতে পারে?'

'হ্যাঁ।' কীর্তি জবাব দিয়েছিল—'আমি কথা বলে এসেছি... বোধহয় আমি আরো বেশিই পাব ... আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তাই...।'

'আমি তো...আমি তো পাঁচশ' টাকার বেশি দিতে পারব না।'

'না।' কীর্তি মজুরের সন্ধানে বাইরের দিকে দেখতে লাগল। মগন টকলা তাকে থামাল—'আর দুশ' নিয়ে নাও।'

'হাজারের চেয়ে কম এক টাকা নেব না।'

মগন হয়রান হয়ে কীর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। আজ কীর্তির মেজাজ অন্যরকমও। ও কি খাজুরাহো গিয়েছিল? দেখা হয়েছিল ট্যুরিস্টদের সঙ্গে? যে-কোনো মূল্যে কলাকারকে তার মার্কেট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু... কিন্তু... সে 'রোলটপ' তুলে আটশ' টাকার নোট গুণে কীর্তির সামনে রাখল। কীর্তি তাড়াতাড়ি তা গুণে দেখে মগনের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলল।

'আমি বলেছি—হাজার টাকার কম নেব না।'

'আচ্ছা, নয়শ' টাকা নাও...'

'না।'

'সাড়ে নয়শ'... নয়শ' পঁচাত্তর..।' কীর্তির দৃষ্টিতে অহংকারের ভাব দেখে সে এক শ' টাকার দশখানা নোট তার হাতে দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো মিথুন-মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ছিল কীর্তি। সে তার আপন শিল্পকর্মের তারিফ শোনার জন্য থেমে গিয়েছিল। মগন মিথুন-মূর্তির মধ্যে রমণী-মূর্তির দিকে তাকাল। সে মূর্তি কীর্তি নিজেই। তার চোখে জল কেন? সে কি আত্মতোষের গভীর অনুভূতির ফল অথবা কোনো জীবন-পীড়নের প্রতীক? তা কি দুঃখ আর সুখ, বেদনা আর বেদনা-উপশমের সম্পর্ক-জাত, যা থেকে পুরো সৃষ্টি উপস্থিত? মগন আবার পুরুষ-মূর্তির দিকে তাকাল—যে মূর্তি ওপর থেকে সুন্দর কিন্তু ভেতরে ছিল পুরো অসুন্দর। কীর্তি কেন পুরুষমানুষের কঠোরতার ওপর জোর দিল ... এই মূর্তি হল মিথুন-মূর্তি, কিন্তু এ তো সে মিথুন নয় যা পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনে হয়... ঠিক আছে ... বিপরীত মূর্তিতে বেশি টাকা পাওয়া যাবে...

মগন টকলা ওপরের দীপদান টেনে এনে পুরুষ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল—

'এই... আমি এই মূর্তিকে কোথায় যেন দেখেছি?'

কীর্তি কোনো জবাব দিল না।

'তুমি।' মগন যেন সবটাই বুঝে ফেলেছে—

'তুমি সিরাজার সঙ্গেই বাইরে গিয়েছিলে?'

কীর্তি এগিয়ে এসে মগন টকলার মুখের ওপর সজোরে এক থাপ্পড় মেরে নোটগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুই হাত

ইসমত চুগতাই

রামঅওতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছে। বুড়ি মেথরানি চিঠি পড়িয়ে নেয়ার জন্য আব্বা মিঞার কাছে এসেছিল। রামঅওতারের 'ছুটি' হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তো! তাই তিন বছর বাদে রামঅওতার ফিরে আসছে। কৃতজ্ঞতাবশত সে দৌড়ে-দৌড়ে সকলের চরণ স্পর্শ করছে যেন এইসব চরণের মালিকেরাই তার একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবিত সুস্থ অবস্থায় ফেরত নিয়ে আসছে।

বুড়ির বয়স পঞ্চাশ বছর হয়েছে; কিন্তু তাকে সত্তর বছরের মতো দেখায়। দশ-বারোটা ছোট-বড় ছেলে জন্ম দিয়েছিল সে। তাদের মধ্যে কেবল রামঅওতারই অনেক মানত-টানত করার ফলে বেঁচে আছে। বিয়ে দেয়ার এক বছর পুরা না-হতেই, রামঅওতারের 'ডাক' এসে গিয়েছিল। মেথরানি অনেক আপত্তি করেছিল; কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কিন্তু যখন রামঅওতার উর্দি পরে শেষবারের মতো তার চরণ স্পর্শ করতে এল, তখন ছেলের দাপট দেখে বুড়িরও বুক ফুলে উঠেছিল, যেন তার ছেলে কর্নেলই হয়ে গেছে।

পেছনের মহলে চাকর-বাকররা হাসছিল। রামঅওতার ফিরে আসার পর যে ড্রামা হবার সম্ভাবনা, সবাই তা নিয়ে উৎসুক হয়ে বসে আছে। যদিও রামঅওতার যুদ্ধক্ষেত্রে কামান-বন্দুক ছুড়তে যায়নি, তবু সিপাহিদের পায়খানা সাফ করতে-করতেও তো তার মধ্যে কিছুটা সিপাহিয়ানা দেখা গেয়েছে। ধূসর উর্দি পরে সেই পুরনো রামঅওতার তো আর সেই লোকটি নেই যে সে গোরীর কার্যকলাপ চুপচাপ শুনবে, তার তরতাজা খুন বদনামির ওপর খেপে না-উঠবে।

বিয়ে করে আনার সময় গৌরীর যৌবন কত মচমচে ছিল। রামঅওতার যতদিন ছিল ততদিন তার ঘোমটা ছিল এক ফুট লম্বা। কেউ তার মুখের রূপ দেখতে পায়নি। যখন পতি বিদেশে গেল তখন সে ভেউ-ভেউ কেঁদেছিল—যেন তার সিঁথির সিঁদুর চিরকালের মতো মুছে যাচ্ছে। কিছুদিন কাঁদো-কাদো চোখে মাথা ঝুঁকিয়ে সে পায়খানার টব বহন করত। তারপর ধীরে-ধীরে তার ঘোমটার দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করেছিল।

কিছু লোকের ধারণা যে, ঐ সময় মেয়েটার শরীরে বসন্ত ভর করেছিল। আর একধাপ এগিয়ে কেউ-কেউ বলেছিল, গোরী একটা ছিনাল। রামঅওতার চলে যাওয়াতেই আপদ এসে জুটেছিল। বদমাশ মেয়ে সব সময় 'হি-হি' করত, সব সময় যেন মদমত্তা হয়ে

হাঁটত। কোমরে পায়খানার টব বসিয়ে কাঁসার কাঁকন ছন্‌ছন্‌ করে যেদিক দিয়ে সে চলে যেত সেদিকে লোকে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়ে থাকত। ধোপার হাত থেকে সাবানের বাটি পিছলে চৌবাচ্চায় পড়ে যেত, তাওয়ার উপর ফুলে-ওঠা রুটি থেকে চলে যেত বাবুর্চির দৃষ্টি। ভিস্তির ডোল ডুবে যেত কুয়াতে। চাপরাশিদের ব্যাজ লাগানো পাগড়ি হেলে গিয়ে কাঁধে ঝুলতে থাকত। আর যখন এই আপদের প্রতিমা ঘোমটার আড়াল থেকে নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করে চলে যেত তখন সারা পেছন-মহল এক নিষ্প্রাণ দেহের মতো স্থবির হয়ে পড়ত। আবার হঠাৎই চমকে উঠে একে অপরের দুর্গতি নিয়ে বিদ্রূপ করত তারা। ধোপানি প্রচণ্ড রাগে মাড়ের কড়াই উল্টে দিত। চাপরাশিনি বুকে চেপে-রাখা ছেলেকে ধমকে উঠত অকারণে। বাবুর্চির তৃতীয় পক্ষের বিবির হিস্টিরিয়া হয়ে যেত।

নামেই কেবল গোরী কিন্তু বদমাশ মেয়েটা কালো কুটকুটে—যেন উল্টানো তাওয়ার উপর কোনো নষ্ট মেয়ে পরোটা ভেজে চমকে উঠে রেখে দিয়েছে। চওড়া ফুঁকদানির মতো নাক, ছড়ানো ঠোঁট। তার সাত পুরুষে দাঁত মাজার ফ্যাশন ছিল না। চোখে বিস্তর কাজল দেয়ার পরেও ডান চোখের টেরাভাব ঢাকা যেত না তার। ঐ টেরা চোখেই সে আবার এমন করে বিষ-মাখানো তীর ছুড়ত যে তা নিশানা ভেদ করত। মোষের চেয়ে চওড়া পা। যে দিক দিয়ে চলে যায় সে দিকে ছড়িয়ে যায় সর্ষের তেলের পচা গন্ধ। হাঁ, কণ্ঠস্বর ছিল আশ্চর্য রকমের মধুর। উৎসব-অনুষ্ঠানে যখন ভাবে বিভোর হয়ে কাজরি গাইত তখন তার কণ্ঠস্বর চলে যেত সবচেয়ে চড়ায়।

বুড়ি মেথরানি ওরফে তার শাশুড়ি, ছেলে চলে যাওয়ার পর গোরীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে। উঠতে-বসতে তাকে রক্ষার জন্য গালি দিত। তার ওপর নজর রাখার জন্য পেছন-পেছন ঘুরত। কিন্তু এখন বুড়ির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। চল্লিশ বছর পায়খানা বহন করার ফলে তার কোমর চিরকালের মতো এক দিকে বেঁকে গিয়ে থেকে গিয়েছিল ওখানেই। সে আমাদের পুরনো মেথরানি। আমাদের জন্মের পরে সে-ই ফুল-নাড়ি ওই মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। মায়ের প্রসববেদনা উঠলে সে এসে বসত চৌকাঠের উপর। আর কখনো কখনো লেডি-ডাক্তারকেও অনেক দরকারি পরামর্শ দিত। টোটকা চিকিৎসার জন্য মন্ত্রপূত তাবিজও নিয়ে বেঁধে দিত পট্টিতে। মেথরানিদের ঘরে সে ছিল গুরুগম্ভীর বয়স্কের মর্যাদায় আসীন।

এমনি জনপ্রিয় মেথরানির পুত্রবধূ হঠাৎ একদিন লোকের চক্ষুশূল হয়ে গেল। চাপরাশিনি আর বাবুর্চিনির তো আরো অভিযোগ ছিল। আমাদের শান্ত-শিষ্ট বউদিদের মাথা তার ঢং দেখে থমকে যেত। আর যে-কামরায় তাদের স্বামীরা আছে সে-কামরা ঝাঁট দিতে যদি সে যেত, তাহলে তারা পড়িমরি করে বুক থেকে দুধের বাচ্চাদের মুখ সরিয়ে দৌড়ত সেখানে যাতে ঐ ডাইনি তাদের স্বামীদের ওপর টোটকা প্রয়োগ না করতে পারে।

গোরী যেন একটা মারকুটে লম্বা শিংওলা ষাঁড়—যা এখানে-ওখানে দিব্যি ছুটে বেড়াত। মেয়েরা তাকে দেখলে নিজ-নিজ কাঁখের বাসন-গামলা দুই হাতে সামলে চেপে ধরত বুকে। আর যখন সে হাল্কা কোমল চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াত তখন পেছন-মহলের মহিলাদের এক হঠাৎ গড়ে-ওঠা প্রতিনিধি-মণ্ডল এসে হাজির হত। মায়ের দরবারে খুব

চেঁচামেচি হত, ভাবী বিপদ আর তার সাংঘাতিক ফলাফল নিয়ে হত তর্কবিতর্ক। পতিরক্ষার জন্য এক কমিটি বানানো হয়েছিল তার কারণে, যাতে সব বউদিরা হৈ-চৈ করে ভোট দিল। মাকে দেয়া হয়েছিল ওই সমিতির সম্মানিত প্রধানের পদ। সব মহিলা নিজ-নিজ পদের মর্যাদা অনুযায়ী পিঁড়ি আর পালঙ্কের কিনারে বসল। পানের দোনা ভাগ করে দেয়া হল তাদের আর ডেকে পাঠানো হল বুড়িকে। বাচ্চাদের মুখে মাই দিয়ে সভায় নিস্তব্ধতা রক্ষা করা হল। পেশ করা হল মোকদ্দমা। আমাদের মা খুব রোয়াবের কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কী রে চুড়েল! তুই বদমাশ বউকে কী এইজন্যে ছেড়ে রেখেছিস যাতে সে আমাদের বুকের উপরে শিল-নোড়া বাটে? তোর মতলবটা কী? মুখে কালি মাখাবি?'

মেথরানিও রেগে উঠল। ফেটে পড়ে বলল, 'কী করব, বেগম সাহেবান? হারামখোরকে চার লাথি মেরে ছিলাম। রুটিও খেতে দিইনি; কিন্তু রাঁড়ি তো আমার কজায় নেই...'

'আরে ওর কি রুটির কিছু কমতি আছে?' বাবুর্চিনি ঢিল ছুড়ল। সাহারানপুরের খানদানি বাবুর্চি ঘরের মেয়ে সে, আবার তৃতীয় পক্ষের বিবি। আল্লার আশ্রয়, কেমন তেজ আর রাগ তার। অন্যদিকে চাপরাশিনি, মালিনী, ধোপানি—সবাই মোকদ্দমাকে আরো সঙিন করে তুলল। বেচারি মেথরানি বসে বসে সকলের লাথি-ঝাঁটা খেতে-খেতে নিজের চুলকানি-ভরা থলথলে গা চুলকাতে লাগল।

'বেগম সাহেবান, আপনি যেমন বলবেন তেমন করতে দ্বিধা করব না। কিন্তু করব কী, মাগির গলা টিপে দেব?'

টেঁটিয়াকে শিক্ষা দেবার তীব্র অভিলাষে ঐ মহিলাদের মনে খুশির ঢেউ উঠছিল। আর সকলেরই মনে বুড়ির প্রতি সীমাহীন দরদ তখন...

মা রায় দিয়েছিলেন—'মড়াটাকে ধরে বাপের বাড়িতে ছেড়ে দে।'

'এ বেগম সাহেবান, এ কি কখনো হতে পারে?'

মেথরানি জানিয়েছিল যে, বউ খালি হাতে আসেনি। সারা জীবনের কামাই পুরো দু'শ' ফেললে তবে এই দামাল মাগী হাতে আসবে। বরং এই টাকায় দুটো গরু কেনা যাবে। অনায়াসে কলসিভরা দুধ দেবে। তখন এই রাঁড়িকে দুই লাথি দেয়া যাবে হয়তো। আর যদি গোরীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া যায় তাহলে এর বাপ খুব তাড়াতাড়ি অন্য মেথরের হাতে বেচে দেবে একে। সে তো কেবল ছেলের শয্যা-শোভা নয়। দুই হাতওয়ালা মেয়েমানুষ, যে চারটে পুরুষ মানুষের কাজ করে ফেলে। রামঅওতার যাওয়ার পর থেকে বুড়ি এত কাজ সামলাতে পারে না। এই বুড়ো বয়সে বউয়ের দুই হাতের সাহায্য নিয়েই চলছে তার।

মহিলারা কেউ অবুঝ নয়। মামলা সামাজিক চালচলন থেকে সরে এসে আর্থিক বাস্তব অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে গেল তখন। সত্যি কথাই, বুড়ির জন্যে বউটা থাকাই দরকার। কার এমন দিল আছে দু'শ' টাকা ফেলে দেবে। এই দু'শ' টাকা ছাড়াও বিয়েতে বেণের কাছ থেকে নিয়ে খরচ করেছে, লোকজন খাইয়েছে। বেরাদরিকে রাজি করিয়েছে। এই সমস্ত খরচ আসবে কোথা থেকে। রামঅওতার যে বেতন পায় তা তো

ধার শুধতেই বেরিয়ে যায়। এমন মোটা-তাজা বউ এখন তো চারশ' টাকার কমে পাওয়া যায় না। পুরো সাফাইয়ের কাজের পর আশপাশের আরো চার কুঠিতে কাজ করে গোরী। মাগী কাজে চৌকস।

মা শেষ সওয়াল দিয়ে দিলেন—'যদি ঐ লুচ্চির জলদি-জলদি কোনো ব্যবস্থা না-কর তো কুঠির হাতায় থাকতে দেওয়া হবে না...'

বুড়ি অনেক চেঁচামেচি করল আর ফিরে গিয়ে প্রাণ ভরে অনেক গালি দিল বউকে। চুল ধরে মারলও। বউ তার কেনা-বউ। সে পিটতে থাকল, হড়বড় করে বকতে থাকল তারপর একদিন সে সব চাকরদের ঘর তছনছ করে দিল প্রতিশোধ হিসেবে। বাবুর্চি, ভিশ্‌তি, ধোপা আর চাপরাশিরা নিজ-নিজ বউদের ধরে-ধরে খুব পিটল। এবারও মেথরানি বউয়ের মামলায় আমার সভ্যা বউদির দল ও সম্ভ্রান্ত ভাইদের মধ্যে খচাখচি হয়ে গেল আর বউদিদের বাপের বাড়িতে তার পাঠানো হতে থাকল। ফলে বউরা প্রতি ঘরে সই-পাখির কাঁটা হয়ে গেল।

দু-চারদিন পরে বুড়ি মেথরানির দেওরের ছেলে রতীরাম আপন জেঠিমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ওখানেই থেকে গেল। দু'-চারটে কুঠিতে কাজ যা বেড়ে গিয়েছিল তা সে সামলে দিল। নিজের গাঁয়ে তো নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার বউ এখনো নাবালিকা, এ-কারণে দ্বিরাগমন হয়নি।

রতীরাম আসায় মৌসুম উল্টে-পাল্টে একেবারে বদলে গেল; যেমন হাওয়ার দমকের সঙ্গে ঘন মেঘের দল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বউকে বলে-বলে সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল। কাঁসার কাঁকন মূক হয়ে গিয়েছিল। যেমন বেলুন থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেলে সেটা চুপচাপ ঝুলতে থাকে তেমনভাবে বউয়ের ঘোমটা ঝুলতে-ঝুলতে নিচের দিকে বেড়েই চলল। এখন সে নাকে দড়ি-না-বাঁধা বলদের বদলে একেবারে লজ্জাবতী বধূ। পেছন-মহলের সব মহিলা সান্ত্বনার নিঃশ্বাস ফেলল। স্টাফের পুরুষরা তাকে খোঁচা দিলে সে লজ্জাবতী লতার মতো নুয়ে থাকত, আর কেউ বেশি চোখ মারলে সে ঘোমটার মধ্যে থেকে অশ্রু-ভেজা চোখের তেরছা নজরে রতীরামের দিকে দেখত, আর দৌড়ে বাহু চুলকাতে-চুলকাতে রতীরামের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেত।

বুড়ি শান্ত হয়ে দেউড়িতে বসে আধ-খোলা চোখে এই মিলনান্ত নাটক দেখতে দেখতে গুড়গুড়িতে টান দিত। চারদিকেই শীতল শান্তি ছেয়ে গিয়েছিল—যেন সব ফোঁড়া থেকে পুঁজ বেরিয়ে গেছে।

এদিকে বউয়ের বিরুদ্ধে এক নতুন দল তৈরি হল আর তাতে যোগ দিল শাগির্দ-পেশার পুরুষেরা। কথায়-অকথায় যে বাবুর্চি একদিন তার পরোটা ভেজে দিত সে পায়খানার টব সাফ না-করার জন্যে গালি দিতে লাগল। ধোপার অভিযোগ সে মাড় লাগিয়ে কাপড় দড়িতে টাঙিয়ে দেয়, আর এই হারামজাদি ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। যে ভিশ্‌তি তার হাত ধুইয়ে দেবার জন্য মশক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আজ তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঙিনায় জল ছিটাবার জন্যে বলে কিন্তু সে শোনে না, ফলে বউ শুকনো জমিতে ঝাড়ু দিয়ে দিলে চাপরাশি ধুলো ওড়ানোর জন্যে দোষারোপ করে তাকে গালি দিতে থাকে।

সে মাথা ঝুঁকিয়ে সকলের তিরস্কার এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। কে জানে বউ শাশুড়িকে গিয়ে কী বলে দিয়েছিল, ফলে বুড়ি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে সকলের মাথা খেয়ে ফেলত। এখন তার দৃষ্টিতে বউ একেবারে শুদ্ধ আর পুরোপুরি ভালো।

দাড়িওলা দারোগাজি হল সব চাকরদের সর্দার। বাবাকে সে আসল পরামর্শদাতা বলে মানত। সে একদিন বাবার কাছে হাজির হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ভয়ানক বদমায়েশি আর শয়তানির কান্না কেঁদে বলল যে বউ আর রতীরাম অনুচিত সম্পর্ক সংস্থাপন করে সারা শার্গিদ-পেশাকে নোংরা করে দিয়েছে। বাবা মামলা সেশনে সোপর্দ করে দিলেন অর্থাৎ এতে লাগিয়ে দিলেন মাকে। মহিলাদের সভা ফের বসল আর বুড়িকে ডেকে আনিয়ে গালাগালি করা হল।

'আরে হারামজাদি, তুই কি জানিস তোর ছিনাল-বউ কী বদামায়েশি করে বেড়াচ্ছে?'

মেথরানি এমনি ঝাপসাভাবে তাকাল যেন সে বুঝতেই পারছে না কার সম্পর্কে কথা হচ্ছে। আর যখন তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলা হল যে চোখে-দেখা সাক্ষীদের বক্তব্য এই যে বউ আর রতীরামের মধ্যে সম্পর্ক অশোভনীয় রকম খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দু'জনকে খুবই যাচ্ছেতাই অবস্থায় ধরা হয়েছে, তখন তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ দেয়াই উচিত ছিল বুড়ির। উল্টে বিগড়ে গেল সে। ভারি ঝামেলা লাগিয়ে দিল। রামঅওতার আজ যদি এখানে থাকত তো যারা তার নিষ্কলঙ্ক বউয়ের ওপর কলঙ্ক লেপন করছে তাদের মজা দেখিয়ে দিত। বউ হারামজাদি তো এখন চুপচাপ, রামঅওতাদের কথা মনে করে চোখের জল ফেলছে। প্রাণ দিয়ে কাজকম্মও করছে। কারুর কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। ঠাট্টা তো কেউ করছে না। লোকে নিছক তার দুশমন বনে গেছে। বুড়ি কাঁদতে শুরু করল। তাকে অনেক বোঝানো হল কিন্তু শোক করতে সে নিজেই এমন চোখ বুঁজে স্থির হয়ে আছে যেন সারা দুনিয়া তার জান নিতে উদ্যোগী হয়েছে। বুড়ি আর তার নিষ্কলঙ্ক বউ লোকের কী ক্ষতিটা করেছে? সে তো কারোর কোনো-কিছুর মধ্যে নেই। বুড়ি নিজে তো সকলের সব রহস্য জানে কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কারোর হাটে হাঁড়ি ভাঙেনি। তার কী দরকার কারোর ছিদ্র অন্বেষণ করার? কুঠিবাড়িগুলোর পেছনে কী-না হয়ে থাকে? মেথরানি কারোর ময়লা লুকিয়ে রাখে না। এই দুই বুড়ো হাতে বড়-বড় লোকের কত পাপ সে মাটিচাপা দিয়েছে। এই দুই হাত ইচ্ছে করলে এখন রানীর সিংহাসন উল্টে দিতে পারে। কিন্তু না। কারোর সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। কিন্তু কেউ যদি তার গলায় ছুরি চালায় তো তাহলে সব-কিছু গড়বড় হয়ে যাবে, যেমন-তেমন কারো-না-কারো চাপা রহস্য আপন বুড়া কল্‌জে থেকে বের করে দেবার দরকার বোধ করি হবে না।

তার ভ্রুভঙ্গি দেখে শীঘ্রই ছুরি-চালানেওয়ালিদের হাত ঝুলে পড়ল। সব মহিলাই তার পক্ষ নিতে লাগল। বউ যাই করুক-না কেন তাদের নিজ-নিজ কেল্লা তো সুরক্ষিত আছে। তা হলে অভিযোগটা হয় কী করে? এবার কিছুদিনের জন্যে বউয়ের প্রেমটা কমে গেল। মানুষও ভুলে গেল ব্যাপারটা। কিন্তু রহস্যভেদকারীরা ধরে নিয়েছিল যে কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। বউয়ের ভারিসারি শরীরও বেশিদিন গণ্ডগোল লুকিয়ে রাখতে পারল না। ফলে লোকে বুড়ির কাছে খুব হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। কিন্তু এই নতুন মামলায়

বুড়ি বিলকুল হাবিজাবি বকতে লাগল। একেবারে এমনি হয়ে যেত যেন একদম শুনতেই পাচ্ছে না। এখন সে প্রায়ই খাটের উপর শুয়ে থেকে বউ আর রতীরামের ওপর হুকুম চালায়। কখনো কাশে, হাঁচে, বাইরে রোদে গিয়ে বসে। এখন ওরা দু'জনে বুড়ির এমনই দেখাশোনা করে যেন সে কোন্ পাটরানি।

ভালো-ভালো বউ-ঝিরা তাকে অনেক বুঝিয়েছে। রতীরামের মুখে কালি মাখাও। আর তারও আগে রামঅওতার ফিরে এসে বউয়ের চিকিৎসা করাক। সে তো নিজেই এই কৌশলে খুব নিপুণ। দু'দিনেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু বুড়ি কিছু বুঝতেই চাইল না। এদিকে-ওদিকে সকলের কাছে অভিযোগ করতে লাগল যে, তাঁর হাঁটুতে আগের চেয়ে বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে। তার কারণ এইসব কুঠিবাড়িতে লোকে বেশি পরিমাণে নিষিদ্ধ দ্রব্য খেতে শুরু করেছে। কোনো-না-কোনো কুঠিতে পায়খানা লেগেই আছে। এতে টালমাটাল বুঝানোওয়ালারা জ্বলে-পুড়ে খাক হতে থাকে। মেনে নাও যে বউ মেয়েছেলের জাত, অজ্ঞ, বোকা। বড়-বড় সম্ভ্রান্ত মহিলার পদস্খলন হয়ে যায়, কিন্তু ওই বড়-বড় ঘরের ইজ্জতদার শাশুড়িরা তো কানে তেল দিয়ে বসে থাকে না। কিন্তু কে জানে কেন এই ষাট বছরের বুড়ি যে বিপদকে সে খুব সহজেই কুঠিবাড়ির জঞ্জালের নিচে কবর দিয়ে দিতে পারে, সে নিজেই এখন চোখ বুজে স্থির হয়ে আছে।

রামঅওতারের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছিল বুড়ি। সব সময়েই ধমক দিত— 'রামঅওতারকে আসতে দাও। বলে দেব। তোদের হাড়মাস এক করে দেবে।'

আর এখন যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে রামঅওতার জীবন্ত ফিরে আসছে। সমস্ত পরিবেশটাই দম বন্ধ করে আছে। এক ভয়ংকর হাঙ্গামার অপেক্ষায় আছে লোকে।

কিন্তু লোকেদের খুব রাগ হল যখন বউ একটি ছেলের জন্ম দিল। কিন্তু তাকে বিষ দেবার বদলে বুড়ি খুব খুশি হয়ে উঠল। রামঅওতার চলে যাওয়ার দু'বছর বাদে ছেলে হবার পর বুড়ি একেবারেই চমকিত হয়নি। ঘরে ঘরে ফাটা-ছেঁড়া পুরনো কাপড় আর অভিনন্দন কুড়োতে লাগল সে। তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা তাকে হিসাব করে অনেক বুঝিয়েছিল যে, এই ছেলে রামঅওতারের হতেই পারে না, কিন্তু বুড়ি সবকিছু বুঝেও সব কথা নস্যাৎ করে দিল। বলল আষাঢ়ে রামঅওতার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল—তখন বুড়ি হলুদ কুঠির নয়া ঢঙের ইংরেজি পায়খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এখন চৈত্রমাস শুরু হয়েছে আর জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়িয়ার লু লেগেছিল কিন্তু খুব জোর বেঁচে গিয়েছিল সে। যখনই তার হাঁটুতে বেদনা বেড়ে যেত, সে বলত—'বৈদ্যজি পুরো হারামি। ওষুধের মধ্যে খড়ি মিশিয়ে দেয়।' এরপর সে আসল কথা থেকে সরে গিয়ে নষ্ট মেয়েছেলে আর বোকাদের মতো উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করত। কারোর-কারো মাথায় এই কথা ঢুকেছিল যে, ওই চালাক বুড়িকে কিছুই বোঝানো যাবে না, কারণ সে না-বোঝার সিদ্ধান্ত করে বসে আছে।

ছেলেটা হবার পর সে রামঅওতারকে চিঠি লিখিয়েছিল। ...'রামঅওতার সমীপে, চুম্বন ও স্নেহ-সম্ভাষণের পরে অত্র সব কুশল জানিয়ে আর তোমার কুশল জানাইবে আর ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি আর তোমার ঘরে একটি পুত্রের জন্ম হইয়াছে সে-কারণে তুমি এই পত্রকে 'তার' বলিয়া জানিবে আর শীঘ্র আসিবে।'

লোকে ভেবেছিল রামঅওতার কিছুটা নারাজ হবে। কিন্তু সকলের আশায় ছাই পড়ল যখন রামঅওতারের খুশিতে ভরা পত্রে জানাল যে, সে ছেলের জন্য মোজা বেনিয়ান নিয়ে আসছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল, এখনই তার আসার কথা। বুড়ি নাতিকে হাঁটুর ওপর শুইয়ে খাটের উপর বসে রাজত্ব করছিল। আচ্ছা, এর চেয়ে সুন্দর বার্ধক্য আর কী হতে পারে! সব কুঠির কাজ হয়ে যাচ্ছে ঝটপট। মহাজনের সুদ সময়মতো কায়দা-মাফিক চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তার নাতি শুয়ে আছে হাঁটুর উপর।

শেষ পর্যন্ত লোকে ভেবে নিল, রামঅওতার যখন আসবে, আসল ব্যাপার বুঝতে পারবে, তখন দেখে নেয়া যাবে। এবার রামঅওতার যুদ্ধ জিতে আসছে। শেষতক ও তো সিপাহি বটে। রক্ত কেন গরম না-হবে? লোকের হৃদয় উৎসাহে ভরে উঠল। পেছনে মহলের বাতাবরণ বউয়ের সংকীর্ণ নজরের কারণে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। দু-চারটে খুন হবার আর নাক কাটবার আশায় জেগে উঠেছিল।

যখন রামঅওতার ফিরে এল তখন ছেলেটার বয়স বছরখানেক। পেছন হলে হৈ-চৈ লেগে গেল। বাবুর্চি হাঁড়িতে অনেক জল ঢেলে দিল, যাতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে কচ্‌কচ্‌ করে মজা থাকতে পারে। ধোপারা মাড়ের কড়াই নামিয়ে মাটিতে রেখে দিল আর ভিশ্‌তি তার ডোল ফেলে দিল কুয়ার ধারে।

রামঅওতারকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই বুড়ি তার কোমর ধরে চেঁচাতে শুরু করল। কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত বের-করা ছেলেটাকে রামঅওতারের কোলে দিয়ে এমনি হাসতে শুরু করে দিল যেন সে কোনোদিন কাঁদেইনি।

রামঅওতার ছেলেটাকে দেখে এমন লজ্জা পেল যেন ছেলেটাই তার বাপ। ঝটপট বাক্স খুলে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করেছিল সে। লোকে ভেবেছিল কুক্‌রি বা চাকু বের করছে কিন্তু সে যখন তা থেকে লাল বেনিয়ান আর হলদে মোজা বের করল, তখন সব চাকর-বাকরদের পৌরুষের ওপর যেন একটা জোর ঘা পড়ল।

'ধেত্‌তেরিকে। শালা সিপাহি হয়েছে... আপাদমস্তক হিজড়া...।' ওদিকে বউ সংকোচে এমনভাবে কুঁকড়ে ছিল যেন সে নববিবাহিতা বধূ। সে কাঁসার থালায় জল ভরে রামঅওতারের দুর্গন্ধভরা ফৌজি বুট খুলে নিয়ে পা ধুয়ে জল খেল।

রামঅওতারকে বুঝিয়েছিল লোকে। বিদ্রূপ করেছিল। তাকে বোকা-বুদ্ধু বলেছিল, কিন্তু সে বোকার মতোই দাঁত বের করে থাকত যেন কিছুই সে বুঝতে পারছে না। রতীরামের দ্বিরাগমন হওয়ার কথা ছিল, সে দেরি না-করে চলে গেল।

রামঅওতারের এই কাজে লোকে যতটা আশ্চর্য হয়েছিল তার চেয়ে বেশি হয়েছিল ক্রুদ্ধ। আমাদের বাবা, যিনি সাধারণত চাকর-বাকরদের সম্পর্কে কৌতূহল দেখাতেন না, তিনিও কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন। সারা কানুনের জ্ঞান প্রয়োগ করে রামঅওতারকে জব্দ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

'কী রে, তুই তিন বছর পরে ফিরলি?'

'হুজুর ঠিক খেয়াল নেই, কিছু কম-বেশি হতে পারে...'

'আর তোর ছেলের বয়স বছরখানেক হবে।'

'এতটাই তো মনে হয় হুজুর, কিন্তু শ্বশুর বড় বদমাশ...'

রামঅওতার লজ্জা পেয়েছিল।

'আরে, তুই এখন হিসাব কর...'

'হিসাব? কী হিসাব করব হুজুর?' রামঅওতার মরা-মরা গলায় বলেছিল।

'উল্লুকের বাচ্চা, এটা কী করে হল?'

'আমি তা কেমন করে জানব, হুজুর। ভগবানের দান।'

'ভগবানের দান? তোর মাথা... এই ছেলে তোর হতে পারে না'... বাবা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে জব্দ করতে চাইছিলেন, রামঅওতার ফের মরা-মরা গলায় বেকুবির সঙ্গে বলল—

'তা আমি কী করব, হুজুর, হারামজাদিকে আমি খুব মেরেছি...' ক্রোধভরে ছিটকে গিয়ে সে বলল।

'আরে, তুই একেবারে উল্লুকের বাচ্চা... বদমায়েশ মাগীটাকে বাইরে বার করে দিসনি কেন?'

'না হুজুর, এ কি কখনো হতে পারে?' রামঅওতার হে-হে করছিল।

'কেন রে?'

'হুজুর, আড়াইশ'-তিনশ' টাকা আবার একটা বিয়ের জন্য কোথা থেকে আনব? আর ভাই-বেরাদারিকে খাওয়াতে একশ-দু'শ' টাকা খরচা হয়ে যাবে...'

'কেন রে, বেরাদারিকে কেন তোর খাওয়াতে হবে? বউয়ের বদমায়েশির জরিমানা কেন তোকে দিতে হবে?'

'তা আমি জানি না, হুজুর। আমাদের সমাজে এই রকমই হয়ে থাকে...'

'কিন্তু ছেলেটা তোর নয়, রামঅওতার ... ঐ হারামি রতীরামের।' বাবা রেগে গিয়ে বোঝালেন।

'তাতে কী হয়েছে, হুজুর...রতীরাম আমার ভাইয়ের মতো—... অন্য কেউ তো নয়... নিজেরই রক্ত সম্পর্কের...

'তুই একেবারে উল্লুকের বাচ্চা।' বাবা খচে গিয়েছিল।

'হুজুর, ছেলেটা বড় হয়ে আমার কাজ গুছিয়ে নেবে।'

রামঅওতার সবিনয়ে বোঝাল, 'সে দুহাত লাগাবে, তখন বুড়ো বয়সের ভার কমে যাবে...'

রামঅওতারের মাথা লজ্জায় ঝুঁকে পড়ল। আর কে জানে কেন একদম রামঅওতারের সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মাথাও ঝুঁকে গেল—যেন তার কাঠামোর ওপর লাখ-লাখ কোটি-কোটি হাত ছেয়ে গেল...এই হাতগুলো পাপপঙ্কিল নয়, শুদ্ধ। এ তো সেই জয়ী—সংগ্রামী হাত যা দুনিয়ার মুখ থেকে ময়লা ধুয়ে নিচ্ছে। তার বুড়ো বয়সের বোঝা তুলছে।

এই মাটিতে লেগে-থাকা কচি-কচি কালো হাত ধরিত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দিচ্ছে।

খুলে দাও

সাদত হাসান মান্টো

অমৃতসর থেকে স্পেশাল ট্রেনটি দুপুর দু'টায় রওনা হয়ে আট ঘণ্টা পর মোঘলপুরা পৌছে। পথে কয়েকজন যাত্রী ক্রমাগত ট্রেনে হামলার ফলে প্রাণ হারায়; বহু যাত্রী হতাহত হয়। কিছুলোক দুষ্কৃতকারীদের হামলা থেকে কোনোমতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

পরদিন সকাল ১০টা। আশ্রয়-শিবিরের ভিজে মাটিতে চোখ মেলে সিরাজউদ্দিন। চারদিকে অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশুদের ভিড় আর জনতার সমুদ্র দেখে তার চিন্তাশক্তি আরও শিথিল হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ সে এক-দৃষ্টিতে ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। উদ্বাস্তু শিবিরের হৈ-হল্লা কিছুই সিরাজউদ্দিনের কানে যায় না। তার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত। কেউ তাকে দেখলে গভীর চিন্তায় মগ্ন বলে মনে করবে কিন্তু আসলে তা নয়; সে চারদিকের কোলাহলময় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন অথচ সবকিছু যেন শূন্যে খেই হারিয়ে যাচ্ছে।

মেঘলা আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সিরাজউদ্দিন; সূর্যের আলোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার দেহের অনুভূতিগুলো পুনঃসজীব ওঠে আর ফিরে আসে তার স্মৃতিশক্তি। তার চোখের সামনে দাঙ্গা, লুটতরাজ, আগুন, হুড়োহুড়ি, দৌড়, স্টেশন, গোলাগুলি অন্ধকার রাত্রি এবং মেয়ে সকিনা প্রভৃতি চিত্র একের পর এক ভেসে ওঠে। মুহূর্তে সিরাজউদ্দিন উঠে দাঁড়ায় এবং পাগলের মতো চারদিকে ইতস্তত জনতার ভিড়ে ঘুরতে থাকে।

তিন ঘণ্টা যাবৎ 'সকিনা' 'সকিনা' নাম ধরে ডেকে-ডেকে শিবিরে তোলপাড় করে চষে বেড়ায় সে। কিন্তু একমাত্র কন্যা সকিনার কোনো সন্ধান মেলে না। চারদিকে বিশৃঙ্খলা। কেউ তার সন্তানকে খুঁজছে, কেউ খুঁজছে মা, কেউ স্ত্রী বা কন্যাকে। সিরাজউদ্দিন পরাজিত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে। কোথায় সে সকিনাকে হারিয়েছে তা স্মরণ করার চেষ্টা করে। তার স্ত্রীর মৃত্যুর ক্ষণটির কথা মনে পড়ে,—তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গিয়েছিল। এর বেশি সে ভাবতে পারে না।

সকিনার মা মারা গেছে। সে সিরাজউদ্দিনের চোখের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু সকিনা কোথায়? মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর সকিনার মা মিনতি করেছে, 'আমার আশা ত্যাগ কর। সকিনাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাও।'

সকিনা তার সঙ্গেই ছিল। দু'জনেই নগ্নপায়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাচ্ছিল। সকিনার ওড়না পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সিরাজউদ্দিন কুড়োতে গেলে সকিনা চিৎকার করে উঠেছিল, 'আব্বা, ওটা ছেড়ে দিন...।' কিন্তু সে তবুও তা কুড়িয়ে নিয়ে কোটের পকেটে রেখেছিল। এ-সব কথা ভাবতে গিয়ে সে ধীরে-ধীরে পকেট থেকে সকিনার ওড়নাটা বের করে। এটা সকিনারই ওড়না; কিন্তু সে কোথায়?

সে শ্রান্ত স্মৃতিশক্তির ওপর অনেক চাপ দিয়েও কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারল না। সে কি সকিনাকে তার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এনেছিল? তারা কি ট্রেনে উঠেছিল একসঙ্গে? পথে ট্রেন থেমেছে? গুণ্ডারা হামলা চালিয়েছে?

তার অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার সময় কি গুণ্ডারা সকিনাকে নিয়ে গেছে? মনে তার অনেক প্রশ্নের ভিড় জমে; কিন্তু তার কোনো জবাব পায় না সে।

তার সান্ত্বনার দরকার। কিন্তু চারদিকে হাজারো মানুষের প্রয়োজন একটি জিনিস, তা হল সান্ত্বনা। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? সিরাজউদ্দিন কাঁদতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু হতভাগ্য চোখদুটি তাকে সাহায্য করে না। অশ্রু যেন শুকিয়ে গেছে।

ছয়দিন পর সিরাজের বোধশক্তি কিছুটা ফিরে আসে। এমন কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করে সে যারা তাকে সাহায্য করতে পারে; এরা আটজন যুবক। তাদের কাছে বন্দুক ও ট্রাক আছে। সিরাজউদ্দিন তাদের হাজার-হাজার আশীর্বাদ জানিয়ে সকিনার আকৃতি বর্ণনা করে, 'দেখতে ফর্সা, খুবই সুন্দরী, মায়ের সঙ্গে চেহারার মিল আছে... বয়স সতের'র কাছাকাছি, ডাগর-ডাগর চোখ... ডান গালে বড় একটি তিল... আমার একমাত্র কন্যা। ওকে খুঁজে দিলে খোদা তোমাদের মঙ্গল করবেন।' তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা আবেগভরে বৃদ্ধকে আশ্বাসবাণী শোনায়, 'যদি তোমার মেয়ে বেঁচে থাকে, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে তাকে উদ্ধার করে তোমার কাছে হাজির করবই।'

একদিন ওরা অসহায়দের সাহায্যের জন্য অমৃতসর যাচ্ছিল; সড়কের উপর 'ছেরট্রার' কাছে একটি তরুণীকে দেখতে পেল তারা। ট্রাকের শব্দ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েটি পালিয়ে যেতে শুরু করল। স্বেচ্ছাসেবকরা গাড়ি থামিয়ে মেয়েটির পিছু ধাওয়া করল। কিছুদূর যাওয়ার পর মেয়েটাকে পাকড়াও করল একটি ক্ষেত থেকে। মেয়েটি সুন্দরী; ডান গালে মোটা কালো তিল। একজন স্বেচ্ছাসেবী প্রশ্ন করল, 'ভয় পেয়ো না, তোমার নাম কি সকিনা?' মেয়েটির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটি বাক্যও তার মুখ দিয়ে বের হল না। স্বেচ্ছাসেবকরা ভরসা দিলে মেয়েটির ভয় দূর হল এবং স্বীকার করল সে সিরাজউদ্দিনের মেয়ে সকিনা।

আটজন স্বেচ্ছাসেবী যুবক তার জন্য অনেক কিছু করল। তাকে দুধ ও রুটি খেতে দিল, ট্রাকে তুলে নিল তারপর। দো-পাট্টার অভাবে সকিনা বারবার বাহু দিয়ে বুক ঢাকবার চেষ্টা করছিল দেখে একজন যুবক কোট খুলে সকিনাকে পরতে দিল।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। সিরাজউদ্দিন সকিনার কোনো সংবাদ পায়নি। সারাদিন ক্যাম্পে এবং বিভিন্ন অফিসে ঘুরঘুর করছে সে। কিন্তু কোনো খোঁজই পায়নি মেয়েটির। রাত গভীর হলে সে স্বেচ্ছাসেবক দলটির সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করল। বেঁচে থাকলে তারা তার মেয়েকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

একদিন সিরাজউদ্দিন স্বেচ্ছাসেবক দলটিকে ট্রাকে দেখতে পেল। ট্রাক তখন ছেড়েই দিয়েছে; সে দৌড়ে গিয়ে তাদের কাছে জিজ্ঞেসা করল, 'বাবারা আমার, সকিনার কোনো খোঁজ পেয়েছ?' তারা ট্রাক থামিয়ে সমস্বরে বলল, "চিন্তা কর না। চিন্তা কর না, পাওয়া যাবেই।' ট্রাক ছেড়ে দিল।

সিরাজউদ্দিন আবার এই যুবকদের সাফল্যের জন্য মোনাজাত করল। এর ফলে তার মনটা অনেকখানি হাল্কা বোধ হল।

ক্যাম্পে সিরাজউদ্দিন বসে ছিল। পাশেই শোনা গেল কিসের হট্টগোল। চার জন লোক কী জানি বহন করে আনছে। জিজ্ঞাসার পর জানতে পারল, রেললাইনের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় একটি মেয়ে পাওয়া গেছে। ওরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। সিরাজউদ্দিন তাদের পিছু পিছু হাসপাতালে গিয়ে হাজির হল। লোকগুলো হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে মেয়েটিকে ন্যস্ত করে চলে গেল।

বাইরে লাইটপোস্টে হেলান দিয়ে সিরাজউদ্দিন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে হাসপাতালের ভেতরে গেল; কামরায় কেউ নেই। একটি স্ট্রেচারে মেয়েটির অচৈতন্য দেহ পড়ে আছে। হঠাৎ ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। প্রাণহীন বিবর্ণ ডান গালে তিল দেখে সিরাজউদ্দিন চিৎকার করে উঠল 'সকিনা...।'

যে ডাক্তার ঘরে বাতি জ্বালিয়েছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?' উদ্বেলিত কণ্ঠে সিরাজ বলল, 'আমি... আমি ওর বাবা।'

ডাক্তার স্ট্রেচারে শায়িতা মেয়েটির নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন এবং সিরাজউদ্দিনকে নির্দেশ দিলেন, 'জানালা খুলে দাও।' স্ট্রেচারে শায়িতা প্রাণহীন দেহ কেঁপে উঠল। কম্পিত হাতে ধীরে-ধীরে সে তার শল্‌ওয়ারের দড়ির গিট খুলে নিচের দিকে নামিয়ে দিল।

বৃদ্ধ সিরাজউদ্দিন আনন্দে চিৎকার করে উঠল 'ও বেঁচে আছে... আমার মেয়ে বেঁচে আছে।' এই দৃশ্য দেখে ডাক্তারের আপাদমস্তক ঘামে ভিজে একাকার।

সর্দারজি

খাজা আহমদ আব্বাস

খোদ দিল্লি আর তার আশপাশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরমে উঠলে মুসলমানদের রক্তের কোনো মূল্য রইল না। আমি ভাবলাম, কী দুর্ভাগ্য! প্রতিবেশী প্রায় সবাই শিখ। ওদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করব কি নিজের পেটেই কখন ছুরি চেপে বসে সেই ভয়ে সময় কাটতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, শিখদের আমি খুব ভয় পাই, ঘৃণাও করি কিঞ্চিৎ। আমার মনে হয় ওরা এক অদ্ভুত জানোয়ার। এই মনে হওয়া সেই আমার ছোটবেলা থেকেই। তখন আমার বয়স বছর ছয়েক। একদিন এক শিখকে রোদে বসে চুল আঁচড়াতে দেখে চিৎকার করে উঠেছিলাম, দেখ, দেখ—মেয়েমানুষের মুখে কত লম্বা-লম্বা দাড়ি। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই বোধ কেমন এক ধরনের ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়। এই বোধটির অবশ্য পেছনে রয়েছে ১৮৫৭ সালের তিক্ত স্মৃতির স্মরণ। সে-সময় হিন্দু-মুসলমানের যৌথ স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য পাঞ্জাবের শিখরাজ আর তাদের সেনাবাহিনী ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। এই কারণে একটা অস্পষ্ট ভীতি ও এক অদ্ভুত ধরনের ঘৃণা কেবল শিখ নয়, ইংরেজদের প্রতিও পোষণ করতাম। তবে শিখ-ঘৃণাটাই ছিল প্রবল; অন্যদিকে ইংরেজদের ভয় পেলেও তাদের প্রতি কিছুটা প্রীতিবোধও ছিল আমার। মনে-প্রাণে আমি ইংরেজদের মতো কোর্ট-প্যান্ট পরতে চাইতাম। চাইতাম ওরা যেমন শ্লীলতাবোধশূন্য কথা-বার্তা চালিয়ে যায় সেভাবে কথাবার্তা বলতে। তাছাড়া ওরা ছিল শাসক, আমিও চাইতাম ছোটখাটো একজন শাসক হতে। ওদের মতো কাটা-ছুরি-চামচ দিয়ে খাবার খাওয়ার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল খুব যাতে পৃথিবীর মানুষ আমাকেও কিছুটা সভ্যভব্য ভাবে। কিন্তু শিখদের যে ভয় করতাম সেটা ছিল অনেকটাই অবজ্ঞা-মিশ্রিত। অদ্ভুত সৃষ্টি এই শিখ—যারা পুরুষ হয়েও চুল রাখে মেয়েমানুষের মতো। ইংরেজি ফ্যাশনের অনুকরণে মাথার চুল ছোট অবশ্য আমি পছন্দ করি না—সেটা ভিন্ন কথা। আব্বা বলতেন, প্রতি শুক্রবার যেন মাথার চুল ছাঁট করি; তাহলে মাথায় খুস্কি হতে পারবে না। কিন্তু আমি সে কথা না-শুনে চুল এমন বড় করে রাখতাম যাতে তা হকি ও ফুটবল খেলার সময় ইংরেজ খেলোয়াড়দের মতো বাতাসে ওড়ে। আব্বা বলতেন, একি! তুই যে মেয়েদের মতো চুল লম্বা রেখেছিস! কিন্তু আব্বা তো পুরনো চিন্তাধারার মানুষ, তাঁর কথা কে শোনে। তিনি তো পারলে ছোটবেলাতেই আমাদের মুখে দাড়ি গজিয়ে দেন। ও হ্যাঁ, মনে পড়ল, শিখদের আর

একটা অদ্ভুত নিদর্শন হল তাদের দাড়ি। আমার দাদার দাড়ি ছিল কয়েক ফুট লম্বা। তিনি সে দাড়িতে চিরুনি ব্যবহার করতেন। কিন্তু দাদাজানের ব্যাপার ভিন্নতম। যতকিছুই হোক তিনি আমার দাদাজান, আর শিখরা শিখ।

ম্যাট্রিক পাস করার পর আমাকে পড়ালেখার জন্যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কলেজে যে-সব পাঞ্জাবি ছেলে পড়ত আমরা অর্থাৎ দিল্লি ইউপির ছেলেরা তাদেরকে নীচ, মূর্খ এবং বখাটে মনে করতাম। ওরা কথা বলার নিয়মও জানত না। পানাহারের মধ্যেও কোনো রুচিজ্ঞান ছিল না। সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। একগুঁয়ে অভদ্রের একশেষ। লাসসির বড়-বড় গ্লাস সাবাড়কারীরা কেওড়াদার ফালুদা ও সিফটন চায়ের স্বাদ কী বুঝবে! তাদের ভাষা নিতান্ত অমার্জিত। কথা বলার সময় মনে হয় যেন ঝগড়া করছে। কথায়-কথায় তুই-তোকারি এই-সেই। আমি সব সময় এসব পাঞ্জাবিদের এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডেন সাহেব—খোদা তাঁর মঙ্গল করুন—হঠাৎ করেই আমার কামরায় একজন পাঞ্জাবি ছাত্রকে জায়গা দিলেন। আমি ভাবলাম, কী আর করা, একত্রে যখন থাকতে হবে কিঞ্চিৎ ভাব পাতিয়েই থাকা যাক। এভাবে থাকতে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে তার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতাই গড়ে উঠল। তার নাম গোলাম রসুল। রাওয়ালপিন্ডিতে বাড়ি। বেশ রসিক ছেলে। আমাকে প্রায়ই চুটকি শোনাত।

আপনারা এখন বলবেন, সর্দার সাহেবের কথা শোনাতে গিয়ে আবার এই গোলাম রসুল কোথা থেকে এসে পড়ল। কিন্তু আসলে এ কাহিনীর সঙ্গে গোলাম রসুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কথা হচ্ছে যে, গোলাম রসুল যে-সব চুটকি শোনাত সেগুলো প্রায়ই শিখদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেসব চুটকি শুনে-শুনে শিখদের স্বভাব-চরিত্র রুচি-বৈশিষ্ট্য ও সামগ্রিক চরিত্র সম্পর্কে আমি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলাম।

যেমন ধরুন গোলাম রসুল বলত, সব শিখই বেকুব এবং বুদ্ধু। দুপুর বারোটা বাজলেই তাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। এ-সম্পর্কে অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন একজন সর্দারজি সাইকেলে আরোহণ করে দুপুর বারোটায় অমৃতসরের হল বাজার দিয়ে যাচ্ছিল। চৌরাস্তায় একজন শিখ কনস্টেবল তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল—তোমার সাইকেলের লাইট কোথায়? সাইকেল আরোহী সর্দারজি বিনয়ে বিগলিত কণ্ঠে বলল, জমাদার সাহেব, এই একটু আগে নিভে গেছে। বাড়ি থেকে তো জ্বালিয়েই বেরিয়েছিলাম! কনস্টেবলটি তখন সর্দারজিকে থানায় চালান দেয়ার হুমকি দিল।

অন্য একজন পথচারী শুভ্র-শ্মশ্রু শিখ সর্দারের মধ্যস্থতা করে বললেন, যাও ভাই, গোলমাল কর না। লাইট যদি নিভে গিয়ে থাকে এখন জ্বালিয়ে নাও, ব্যস।

এ ধরনের বহু গল্প গোলাম রসুলের জানা ছিল। পাঞ্জাবি ভাষার সংমিশ্রণে সে যখন এসব গল্প শোনাত তখন হাসতে-হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যেত। আসলে পাঞ্জাবি ভাষায়ই সে-সব গল্প শুনে মজা পাওয়া যেত। কারণ, শিখদের অদ্ভুত ও উদ্ভট তৎপরতা বর্ণনা করার জন্যে পাঞ্জাবির মতো উটকো ভাষাই ছিল মানানসই।

সে থাকগে। অন্যের চালচলন নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা করে লাভ নেই! কিন্তু শিখদের সবচেয়ে বড় দোষ হল ওরা ঔদ্ধত-হঠকারিতা-মারদাঙ্গা করে মুসলমানদের

মোকাবেলা করতে সাহস দেখাত। এখন তো পৃথিবী জেনেই গেছে যে, একজন মুসলমান দশজন হিন্দু বা শিখের সমান। কিন্তু মুসলমানদের এ শক্তিমত্তা তারা স্বীকার করত না। তারা কৃপাণ ঝুলিয়ে গোঁফে এমনকি দাড়িতে তা দিয়ে চলত। গোলাম রসুল বলত, ওদেরকে একদিন আমরা এমন শিক্ষা দেব যে, জীবনভর মনে থাকবে।

কলেজ ছাড়ার পর কয়েক বছর কেটে গেল। ছাত্র থেকে ক্লার্ক, ক্লার্ক থেকে হেড ক্লার্ক পদে উন্নীত হলাম। আলিগড় ছাত্রাবাস ছেড়ে নয়াদিল্লিতে একটা সরকারি কোয়ার্টারে থাকি। বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে-মেয়েও হয়েছে। রাওয়ালপিন্ডি থেকে বদলি হয়ে আমার মুখোমুখি কোয়ার্টারে একজন শিখ সর্দার এসে উঠলে বহুদিন পর গোলাম রসুলের কথা আমার মনে পড়ল। গোলাম রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাওয়ালপিন্ডিতে শিখদের আচ্ছাসে ধোলাই দেয়া হয়েছে। মুজাহিদরা শিখদের নির্মূল অভিযান শুরু করেছিল। শিখরা সেখানে দারুণ দাপট দেখাচ্ছিল, মুসলমানদের সামনে সেসব দাপট টেকেনি। দাড়ি কামিয়ে অনেক শিখকে মুসলমান করা হয়েছে, অনেককে খৎনা করিয়ে দেয়া হয়েছে জোর করে। হিন্দুদের সংবাদপত্রে মুসলমানদের দুর্নাম রটানোর জন্যে লেখা হচ্ছিল যে, মুসলমানেরা, শিখ নারী ও শিশুদেরকেও হত্যা করেছে। অথচ এটা ইসলামি ঐতিহ্য পরিপন্থী। মুসলিম মুজাহিদরা কখনো নারী ও শিশুদের ওপর হাত তোলেনি। হিন্দুদের সংবাদপত্রে যেসব শিখ নারী ও শিশুর ছবি ছাপা হয়েছে সেগুলো ছিল হয় জাল ছবি অথবা শিখরা মুসলমানদের দুর্নাম রটানোর জন্যে নিজেরাই নিজেদের নারী ও শিশুকে হত্যা করে পত্রিকায় ছেপেছিল। রাওয়ালপিন্ডি এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানদের এ অপবাদও দেয়া হচ্ছিল যে, তারা হিন্দু ও শিখ মেয়েদের অপহরণ করেছে। অথচ ঘটনা এই যে, মুসলমানদের বীরত্ব দেখে শিখ মেয়েরা মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে তাদের সঙ্গে চলে গেছে। এমতাবস্থায় ওরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় পালিয়ে যায় তাতে মুসলমানদের দোষটা কোথায়? তারা তো ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবেই সে সব মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে।

সে যাই হোক, শিখদের তথাকথিত বীরত্বের চেহারা এখন পাল্টে গেছে। এখন কৃপাণ বের করে মুসলমানদের হুমকি দেয়া দূরে থাক রাওয়ালপিন্ডি থেকে পালিয়ে আসা সর্দারের দুরবস্থা দেখে ইসলামের গৌরবে বুক ফুলে উঠল আমার।

আমার প্রতিবেশী সর্দারজির বয়স ষাটের কাছাকাছি। দাড়ি সব শাদা হয়ে গেছে। তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেছেন। ভদ্রলোক সব সময় দাঁত বের করে হাসতেন। তাঁর এ হাসি দেখেই বুঝেছিলাম লোকটা আসলে বেকুব এবং নির্বোধ। প্রথম দিকে তিনি আমার সঙ্গে মিতালি পাতাতে চেয়েছিলেন। যাওয়া-আসার সময় গায়ে পড়ে আলাপ করা শিখদের এক আজব রীতি। সেদিন তো বাসায় প্রসাদের মিষ্টান্নই পাঠিয়ে দিলেন। (আমার স্ত্রী সে মিষ্টান্ত সঙ্গে-সঙ্গে মেথরানিকে দিয়ে দিয়েছে) আমি আর বন্ধুত্বের ফাঁদে ধরা দিইনি, কখনো কিছু জিজ্ঞেস করলে মামুলিভাবে দু-একটা কথা জবাব দিয়ে চুপচাপ কেটে পড়েছি। আমি জানতাম ভালোভাবে কথা বললে এ লোক আমার পিছু নেবে। আজ ভালোভাবে আলাপ করবে, কালই গালাগালি শুরু করবে। আপনারা তো জানেন যে, গালাগালি শিখদের ডাল-রুটি। এ-ধরনের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে কে নিজের

মুখ খারাপ করবে? একদিন দুপুরে আমি গিন্নিকে শিখদের নির্বুদ্ধিতার কাহিনী শোনাচ্ছিলাম। বাস্তব প্রমাণ দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি ঠিক বারোটায় আমার ভৃত্যকে সর্দারজির বাসার ঘড়িতে ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করার জন্যে পাঠালাম। সর্দারজি ভৃত্যকে বললেন, বারোটা দু'মিনিট। আমি গিন্নিকে বললাম, দেখলে তো বারোটা বাজার নাম নিতেই ভয় পাচ্ছে। এ-কথা বলে আমি একচোট হাসলাম, গিন্নিও হাসল। আমি মাঝে-মাঝে অপ্রস্তুত করার জন্যে সর্দারজিকে জিজ্ঞেস করতাম, কেমন সর্দারজি, বারোটা বেজে গেছে? তিনি নির্লজ্জভাবে দাঁত বের করে জবাব দিতেন—জ্বী, আমাদের এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই বারোটা বেজে থাকে। এ-কথা বলে খুব হাসতেন—যেন বড় একটা রসিকতা করতে পেরেছেন।

শিশুদের ব্যাপারে সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকতাম। একে তো কোনো শিখের ওপরই আস্থা রাখা যায় না। শিশুদের গলায় কখন কৃপাণ চালিয়ে দেবে কে জানে! তাছাড়া এরা রাওয়ালপিন্ডি থেকে এসেছে। মুসলমানদের প্রতি এমনিতেই মনে-মনে নিশ্চয়ই ঘৃণা পোষণ করে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওঁত পেতে থেকে সুযোগ খুঁজবে। স্ত্রীকে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম শিশুদের যেন সর্দারজির কোয়ার্টারের দিকে যেতে দেয়া না হয়। কিন্তু শিশুরা তো শিশুই। ক'দিন পর দেখি, আমার ছেলে-মেয়েরা সর্দারজির ছোট মেয়ে মোহিনী এবং তার নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলা করছে। বড়জোর দশ বছর বয়সের মোহিনী আসলেই ছিল মোহিনী। গৌরবর্ণ চমৎকার চেহারা। হতভাগাদের মেয়েরা দারুণ সুন্দরীও হয়। আমার মনে পড়ল, গোলাম রসুল বলত, পাঞ্জাব থেকে শিখ পুরুষরা চলে গিয়ে যদি মেয়েদের রেখে যেত তাহলে হুর-এর সন্ধান করার প্রয়োজন হত না। আমার সন্তানদের সর্দারজির মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলতে দেখে আমি ওদের টেনে বাসায় নিয়ে এলাম। তারপর খুব মারলাম। এরপর অন্তত আমার চোখের সামনে কখনো ওদের আর ওদিকে যেতে দেখিনি।

খুব অল্প সময়ে শিখদের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ল। রাওয়ালপিন্ডি থেকে সুড়সুড় করে পালিয়ে এসে, পাঞ্জাবের মুসলমানদের সংখ্যায় কম পেয়ে তাদের ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে দিল। শত-শত এমনকি হাজার-হাজার মুসলমানকে তাদের হাতে শহীদ হতে হল। নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হল মুসলমানকে রক্ত। হাজার-হাজার মুসলিম মেয়ে ও মহিলাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে মিছিল বের করল ওরা। এ-সব কারণে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বহুসংখ্যক মুসলমান দিল্লিতে আসতে শুরু করল। তার ঢেউ এই দিল্লিতে আমার এখানে এসে পৌছান ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পাকিস্তান যাওয়ার তখনো কয়েক সপ্তাহ বাকি। এ কারণে বড় ভাইয়ের সাথে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বিমানযোগে করাচি পাঠিয়ে দিয়ে নিজে খোদা ভরসা করে থেকে গিয়েছিলাম। উড়োজাহাজে বেশি জিনিসপত্র নেয়া যায় না। এ-কারণে আমি একটা পুরো ওয়াগন বুক করেছিলাম। কিন্তু যেদিন জিনিসপত্র ওয়াগনে তুলব সেদিনই শুনলাম পাকিস্তানি গাড়িতে হামলা করা হচ্ছে। ফলে ঘরের জিনিসপত্র রইল ঘরেই।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা উৎসব পালন করা হল। কিন্তু এ স্বাধীনতার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি ছুটি পালন করলাম। সারাদিন শুয়ে-শুয়ে 'ডন' আর

'পাকিস্তান টাইমস' পড়ে কাটালাম। উভয় পত্রিকায় ভারতের এ তথাকথিত স্বাধীনতার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। প্রমাণ দেয়া হয়েছে কী করে ইংরেজ ও হিন্দুরা যোগসাজশ করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কেবল কায়েদে আজমের বুদ্ধিমত্তার কারণেই আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছি। যদিও হিন্দু ও শিখদের চাপের মুখে ইংরেজরা অমৃতসর ভারতকে দিয়ে দিয়েছে তবু দুনিয়ার সবাই জানে যে-অমৃতসর খাঁটি ইসলামি শহর, এখানকার স্বর্ণ-মসজিদ বিশ্ববিখ্যাত। সেখানে কোনো গুরুদোয়ারা নেই যে, তাকে গোল্ডেন টেম্পল বলা যাবে। মসজিদ তো দিল্লিতেও রয়েছে; শুধু স্বর্ণ মসজিদই নয়, জামে মসজিদ, লালকেল্লা, নিজামুদ্দিন আওলিয়ার মাজার, হুমায়ুনের সমাধিসৌধ, সফদার জঙ্গ-এর মাদ্রাসা রয়েছে এখানে। মোটকথা দিল্লির আনাচে-কানাচে মুসলিম শাসনামলের নিদর্শনে ভরা। তবুও আজ সেই দিল্লি বরং বলা উচিত শাহজাহানাবাদে আজ হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। আমি আবেগরুদ্ধ হৃদয়ে ভাবলাম, এই দিল্লি ছিল এক সময় মুসলমানদের রাজসিংহাসনের জায়গা, সভ্যতা-সংস্কৃতির পাদপীঠ। এই দিল্লি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আর আমাদের পাঠানো হচ্ছে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতি বিরান, অনুন্নত, অসংস্কৃত অঞ্চলসমূহে জোরপূর্বক। এ-সব এলাকায় মার্জিত উর্দুতে কেউ কথা পর্যন্ত বলতে জানে না। সালোয়ারের মতো হাস্যকর পোশাক পরে সেখানকার মানুষ। হালকা-পাতলা চাপাতির বদলে দু সের ওজনের নানরুটি খায়। এসব ভেবেও নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, কায়েদে আজম এবং পাকিস্তানের জন্যে এ-ত্যাগ স্বীকার আমাদের করতেই হবে। কিন্তু তবুও দিল্লি হাত ছাড়া হওয়ার চিন্তায় মনটা বিষণ্ন-বিমর্ষ হয়েই রইল। বিকেলে আমি বাইরে বেরোলাম। সর্দারজি দাঁত বের করে বললেন, কেমন বাবুজি, আজ উৎসব পালন করোনি? আমার ইচ্ছে হল তার দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই। শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা গৌরবচিত্ত শিখদের মনে রং ধরাল। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা হাজারের অঙ্ক ছেড়ে লাখের ঘরে গিয়ে পৌঁছুল। এসব লোক আসলে পাকিস্তানের দুর্নাম রটানোর জন্যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। এখানে এসে সর্বত্র নিজেদের দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসি প্রোপাগান্ডা জোরে-শোরে চলছে। কংগ্রেসিরা কৌশল গ্রহণ করেছে যে কংগ্রেসের নাম না-নিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ এবং শহীদী দিল নাম নিয়ে কাজ করতে হবে। অথচ এটা তো সবাই জানে যে, এই হিন্দুরা কংগ্রেসী মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পৃথিবীর মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে তারা প্রয়োজন হলে গান্ধী এবং জওহেরলাল নেহরুকে লোক দেখানো গালি দিতেও দ্বিধা করে না।

একদিন সকালে খবর এল যে, দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে। কুরলবাগ এলাকায় মুসলমানদের বহু বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। চাঁদনি চকে মুসলমানদের দোকানপাট লুণ্ঠন করে তাদের পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়েছে। এটা হল কংগ্রেসের হিন্দু-রাজত্বের নমুনা। যাক সে কথা। আমি ভাবলাম নয়াদিল্লি তো বহুকাল ধরে ইংরেজদের শহর ছিল—লর্ড মাউন্টব্যাটেন, কমান্ডার-ইন-চিফ এখানে

থাকেন। অন্ততপক্ষে তারা মুসলমানদের ওপর এ-ধরনের অত্যাচার হতে দেবেন না। এটা ভেবে আমি নিজের অফিসের পথে পা বাড়ালাম। সে-দিন আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব হওয়ার কথা। আসলে এ-কারণেই আমি পাকিস্তানে যেতে দেরি করছিলাম। গোল মার্কেটের কাছে পৌছতেই অফিসের একজন হিন্দু বাবু বললেন, এ কী করছ, যাও, যাও বাসায় যাও, বাইরে বেরিয়ো না। কনট প্লেসে দাঙ্গাকারীরা মুসলমানদের মেরেছে। এ-কথা শুনে আমি বাসায় ফিরে এলাম।

বাসার সামনে আসতেই সর্দারজির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, শেখজি, চিন্তা করবেন না। আমি যতক্ষণ সহি-সালামতে আছি, কেউ আপনাকে হাত লাগাতে পারবে না। আমি ভাবলাম, শিখের ওই দাড়ির আড়ালে কত শয়তানি লুকিয়ে আছে কে জানে। মনে-মনে খুব খুশি যে, মুসলমানদের পাইকারিভাবে নিধন করা হচ্ছে অথচ মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করছে। আসলে আমাকে চটানোর জন্যেই এ-ধরনের কথা বলছে। কেননা এই এলাকায় আমিই একমাত্র মুসলমান।

কিন্তু আমি কাফেরদের কোনো অনুগ্রহের প্রত্যাশী নই। এটা ভেবে নিজের ঘরে এলাম। ভাবলাম যদি মরেও যাই দশ-বিশটাকে মেরে মরব। সোজা কামরায় প্রবেশ করে পালঙ্কের নিচে উঁকি দিলাম—সেখানে আমার দোনলা শিকারি বন্দুক রয়েছে। দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর থেকে আমি প্রচুর গুলি ও কার্তুজ সংগ্রহ করে রেখেছি। কিন্তু এ ক! পালঙ্কের নিচে বন্দুক নেই। সব কামরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও বন্দুক পাওয়া গেল না।

হুজুর, আপনি কী খুঁজছেন। আমার অনুগত বিশ্বস্ত ভৃত্য মামদো জিজ্ঞেস করল।

আমার বন্দুক কোথায় গেল?

মামদো কোনো জবাব দিল না। কিন্তু তার মুখভাব বলে দিচ্ছিল, সে জানে বন্দুক কোথায় আছে। হয়তো সে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

বলছিস-না কেন? আমি ধমক দিয়ে বললাম।

ধমক দেয়ায় জানা গেল—মামদো আমার বন্দুক চুরি করে তার বন্ধুদের দিয়েছে। ওরা দরিয়াগঞ্জে মুসলমানদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে অস্ত্র সংগ্রহ করছে।

আমাদের কাছে কয়েকশ' বন্দুক আছে হুজুর। সাতটি আছে মেশিনগান। দশটি রিভলবার। একটি তোপ। কাফেরদের ভুনা করে ফেলব। ভুনা।

আমি বললাম, দরিয়াগঞ্জে আমার বন্দুক দিয়ে কাফেরদের ভুনা করলে এখানে আমার আত্মরক্ষার উপায় কীভাবে হবে? আমি তো এখানে কাফেরদের দঙ্গলের মধ্যে আটকা পড়ে আছি। এখানে আমাকে ধুনো দেয়া হলে কে দায়ী হবে?

মামদোকে বললাম, কোনো-না-কোনোভাবে চুপিসারে তুমি দরিয়াগঞ্জে যাও। সেখান থেকে আমার জন্যে একটা বন্দুক এবং শ' দুয়েক কার্তুজ নিয়ে এস।

মামদো চলে যাওয়ার পর আমার স্থির বিশ্বাস হল যে, সে আর ফিরে আসবে না।

এখন আমি বাসায় সম্পূর্ণ একাকী। সামনের কার্নিশে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের ফটো নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে আমার চোখে পানি এসে গেল। ভাবলাম তাদের সাথে আর দেখা হবে কিনা কে জানে।

পরে এটুকু ভেবে স্বস্তিবোধ করলাম যে, তারা তো অন্তত ভালোয়-ভালোয় পাকিস্তান পৌঁছে গেছে। আমি যদি প্রভিডেন্ট ফান্ডের লোভ না-করে আগেই চলে যেতাম তাহলে কী ভালোই-না হতো! এখন আর আফসোস করে কী হবে?

সাতশ্রী আকাল হর হর মহাদেব!

দূর থেকে কোরাসকণ্ঠের আওয়াজ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিল। এরা দাঙ্গাকারী। আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আহত হরিণের মতো আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। সেই আহত হরিণ গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তার পেছনে লেগে আছে শিকারি কুকুর। আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় নেই। কামরার দরজা পাতলা কাঠের তৈরি। ওপরের দিকে গ্লাস ফিট করা। আমি দরজা বন্ধ করে বসে থাকলেও দু'মিনিটের মধ্যেই দাঙ্গাকারীরা দরজা ভেঙে ভেতরে চলে আসবে।

সাতশ্রী আকাল হর হর মহাদেব—এ-আওয়াজ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিল।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত হল। সর্দারজি ভেতরে প্রবেশ করে বললেন, শেখজি, তুমি আমাদের ঘরে চল। তাড়াতাড়ি কর। কিছু চিন্তা-ভাবনা না-করেই সর্দারজিকে অনুসরণ করলাম। পেছনের দিকের বারান্দায় আমাকে লুকিয়ে রাখা হল। মৃত্যুর গুলি শন করে আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কারণ আমি সর্দারজির ঘরে প্রবেশ করার পর-পরই আমাদের বাসার সামনে এসে থামল একটা লরি। সে লরি থেকে দশ-পনেরো জন যুবক নামল। যুবকদের মধ্যে নেতা-গোছের একজনের হাতে টাইপ করা একটা কাগজে নামের তালিকা রয়েছে। ৮নং কোয়ার্টারে শেখ বোরহান উদ্দিন—কাগজের উপর তাকিয়ে যুবনেতা উচ্চারণ করল। উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার কোয়ার্টারে। আমার চেয়ার, টেবিল, সিন্দুক, বই-পুস্তক ইত্যাদি এমনকি আমার ময়লা জামা-কাপড় সবকিছু লরিতে নিয়ে তোলা হয়।

ডাকাত!

লুটেরা!

দস্যু!

ভাবলাম সর্দারজি বাহ্যিক সহানুভূতি দেখিয়ে আমাকে যে এখানে নিয়ে এলেন তিনিই কি কম লুটেরা? তিনি দাঙ্গাকারীদের বললেন, থামো, থামো, এ-ঘরের ওপর আমার অধিকার বেশি রয়েছে। এ-লুণ্ঠনে অংশ নেয়ার অধিকার আমারও পাওয়া দরকার। এ-কথা বলেই তিনি নিজের ছেলে-মেয়েদের ইঙ্গিত করলেন। তারাও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হল। কেউ প্যান্ট নিয়ে গেল, কেউ স্যুটকেস, কেউ আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ছবি। এসব গনিমতের মাল সোজা অন্দরমহলে চলে যাচ্ছে।

মনে-মনে ভাবলাম যদি বেঁচে থাকি তবে, ওরে সর্দার, তোর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। কিন্তু এখন তো আমি টুঁ শব্দও করতে পারছি না। সশস্ত্র দাঙ্গাকারীরা আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। যদি তারা জানতে পারে যে আমি এখানে আছি—

'এস, ভেতরে এস।' হঠাৎ দেখি সর্দারজি নগ্ন তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাকে বাড়ির ভেতরে ডাকছেন। আমি বৃদ্ধের চেহারার দিকে তাকালাম। লুটপাটে অংশ নেয়ার

ছুটোছুটিতে তার চেহারা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তার হাতের চকচক করা কৃপাণ আমাকে মৃত্যুর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

কথা বলার সময় নেই। যদি আমি কিছু বলি এবং দাঙ্গাকারীরা শুনতে পায় তাহলে একটা গুলি আমার বুক ভেদ করে যাবে।

কৃপাণ এবং বন্দুকের মধ্যে যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে। দাঙ্গাবাজ দশটি যুবকের চেয়ে একজন বৃদ্ধের কৃপাণ অনেক ভালো। আমি নীরবে কামরায় প্রবেশ করলাম।

ওখানে নয়, ভেতরে এস।

আমি ভেতরের দিকের একটি কামরায় গেলাম। মনে হচ্ছিল, কসাইখানায় বকরি প্রবেশ করছে। আমার চোখ কৃপাণের তীক্ষ্ণ ধারে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

এই নাও তোমার জিনিসপত্র। এ-কথা বলে সর্দারজি নিজে এবং তার ছেলেমেয়েরা মিছেমিছি লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি আমার সামনে এনে রাখল।

সর্দার-গিন্নি বললেন, বাবা তোমার কোনো জিনিসই বলতে গেলে রক্ষা করতে পারলাম না।

আমি কোনো কথা বললাম না।

হঠাৎ বাইরে ঝনঝন শব্দ শোনা গেলে। দাঙ্গাকারীরা আমার লোহার আলমারি বাইরে বের করে সেটি ভাঙার চেষ্টা করছে।

একজন বলল, এর চাবি পাওয়া গেল সহজে ঝামেলা মিটে যেত। অন্যজন বলল, এর চাবি তো পাকিস্তানে পাওয়া যাবে। ভীরু তো, তাই পালিয়ে গেছে। মুসলমানের বাচ্চা হলে তো মোকাবেলা করত!

ছোট্ট মোহিনী আমার স্ত্রীর কয়েকটি রেশমি কামিজ এবং ঘাঘরা দাঙ্গাকারীদের কবল থেকে কেড়ে নিচ্ছিল। ওদের উক্তি শুনে সে বলল, 'হুঁ হুঁ! তোমরা বড় বাহাদুর বটে! শেখজি ভীরু হতে যাবেন কেন? তিনি তো পাকিস্তানে যাননি।'

একজন যুবক বলল, যদি না-ও গিয়ে থাকে তবে এখানে কোথাও মুখ কালো করে লুকিয়ে আছে।

মুখ কালো করে লুকোবে কেন, উনি তো আমাদের এখানে।

আমার হৃৎস্পন্দন মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল। মোহিনী নিজের ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে রইল। কিন্তু দাঙ্গাবাজদের জন্যে এটুকু তথ্যই যথেষ্ট।

সর্দারজির মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল। তিনি আমাকে ভেতরের অন্য একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় হুক লাগিয়ে দিলেন। তারপর নিজের পুত্রকে কৃপাণ হাতে দরজায় রেখে নিজে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে কী হল আমি তখনো ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। তবে চড়-থাপ্পড় এবং পরক্ষণে মোহিনীর কান্না শোনা গেল। তারপর পাঞ্জাবি ভাষায় সর্দারজির মুখ নিঃসৃত অশ্লীল খিস্তি-খেউড়। বুঝতে পারলাম যে, কাকে এবং কেন তিনি গালি দিচ্ছেন। আমি চারদিক থেকে বন্দি ছিলাম, এ কারণে সঠিক কিছু শুনতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পর গুলিবর্ষণের আওয়াজ শোনা গেল। সর্দার-গিন্নি তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন।

লরির ঘরঘর আওয়াজ শোনা গেল ক্ষণিক পরেই। সমগ্র বিল্ডিং এলাকায় নৈঃশব্দ ছেয়ে গেল। আমাকে কক্ষবন্দি অবস্থা থেকে বের করার পর দেখি সর্দারজি পালঙ্কের উপরে পড়ে আছেন, তার বুকের কাছাকাছি জায়গায় সাদা কামিজ ভেদ করে রক্তধারা গড়াচ্ছে। তার পুত্র প্রতিবেশীর বাসা থেকে ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেছে।

সর্দারজি! এ তুমি কী করলে? নিজের অজ্ঞাতেই আমার মুখ থেকে এ-কথা বেরিয়ে এল। আমি স্তব্ধ বিমূঢ় দাঁড়িয়ে রইলাম কেবল। আমার চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি লোপ পেয়ে গেছে তখন।

সর্দারজি, এ তুমি কী করলে?

আমার ঋণ পরিশোধ করলাম, খোকা!

ঋণ!

হ্যাঁ খোকা! রাওয়ালপিন্ডিতে তোমার মতোই একজন মুসলমান নিজের জীবন দিয়ে আমার এবং আমার পরিবারের জীবন ও ইজ্জত রক্ষা করেছে।

তার নাম কী ছিল সর্দারজি?

গোলাম রসুল।

গোলাম রসুল? আমার মনে হল ভাগ্য যেন আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। দেয়ালের ঘড়িতে বারোটা বাজল। এক দুই তিন চার পাঁচ...।

সর্দারজি হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালেন। তিনি যেন হাসছেন। আমার নিজের দাদার কথা মনে পড়ল। তার মুখে কয়েক ফুট লম্বা দাড়ি ছিল। সর্দারজির চেহারা তার চেহারার সাথে যেন মিলে যাচ্ছে। ছয় সাত আট নয়...।

সর্দারজি যেন হাসছিলেন। তাঁর শাদা দাড়ি এবং খোলা চুল চেহারার চারদিকে একটি আলোক আভা তৈরি করেছে।

দশ এগারো বারো। মনে হল সর্দারজি যেন বলছেন—জ্বী হ্যাঁ, আমাদের এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই বারোটা বেজে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্দারজির দু'চোখ বুজে গেল।

দূর, বহু দূর থেকে যেন গোলাম রসুলের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল : আমি বলেছি না, বারোটা বাজলেই শিখদের বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়? এখন এই সর্দারজিকে দেখ। একজন মুসলমানের জন্যে নিজের জীবন দিলেন।

সর্দারজি সেদিন মারা যাননি, আমিই মরেছি।

প্রতিশোধ

খাজা আহ্‌মদ আব্বাস

দুটো রঙের বিভীষিকা। ভয়ঙ্করের প্রেতচ্ছায়া অদৃশ্য কায়াহীন পদসঞ্চারে পিছু নিয়েছে তার দিনরাত্রির।

লাল, টক্‌টকে লাল; আর ফ্যাকাশে হলুদ, ভয়াবহ বিবর্ণতা।

লাল। মানুষের তাজা খুন যেন।

হলুদ। মড়ার মুখের রক্তশূন্য পাণ্ডুরতা!

লাল আর হলুদ, হলুদ আর লাল, বাতাসের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে রঙ দুটোর বুদ্বুদ।

হলুদ আর লাল, লাল আর হলুদ—প্রেতায়িত সূর্যরশ্মির তীব্রতা তার চোখ ভেদ করে সোজা মগজে খোঁচা মারছে; হাজার হাজার অদৃশ্য সূঁচের মতো লাল আর হলুদ রশ্মির তীক্ষ্নতা তার সমস্ত দেহ খুঁচিয়ে বিঁধছে।

দিনে-রাত্তিরে, কি জাগরণে, কি নিদ্রায়—হয়তো হাঁটছে, হয়তো-বা বসে রয়েছে—সবসময়েই চোখের সামনে বিভীষিকার ভয়ঙ্কর আবৃত রঙ দুটোর শিখা নাচতে থাকে নারকীয় দানবের অজস্র লকলকে জিভের মতো। শয়তানের অগ্ন্যুৎসবে কাঠের বদলে পোড়ানো হচ্ছে অগুণতি মড়া। হাজার শব জ্বলছে এক চিতায়; আর অসংখ্য অদেহী আত্মা চারদিক ঘিরে নাচছে মৃত্যুতাণ্ডবের অদৃশ্য নাচ। তাদের ভীতিসঞ্চারী গর্জনে ধ্বনিত হচ্ছে :

প্রতিশোধ!

প্রতিশোধ!!

প্রতিশোধ!!!

লাল আর হলুদ, হলুদ আর লাল—রঙ দুটোর জ্বলন্ত পাবকশিখার তীক্ষ্নতা বেঁধে ফেলছে তার দেহমন আত্মার সামগ্রিকতাকে। কি প্রভাতের অরুণিমায়, কি সূর্যাস্তের মৃত্যুগরিমায় রঙ দুটোর শিখা তার চোখের সামনে সবসময়েই জ্বলতে থাকে। শিরার ভেতরে প্রবাহিত হতে থাকে জ্বলন্ত আগুনের তরলতা। রক্ত কোথায়? প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে ভেসে আসে অগ্নিদাহের ধোঁয়ার গন্ধ। মাঝে মাঝে মনে হয় সে বুঝি মানুষী সত্তা হারিয়ে নরকের অদৃশ্য আগুনে প্রেতাত্মায় রূপান্তরিত হয়েছে।

সবাই জানে হরিদাস পাগল হয়ে গেছে। হরিদাসও কথা কয় না কারো সঙ্গে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—কারো সঙ্গে নয়। এই নির্বাকতাই তার মস্তিষ্কবিকৃতির যথেষ্ট

পরিচায়ক। তা নাহলে সে কথা কয় না কেন? রাজ্যের যত মজার মজার মুখরোচক উত্তেজক আলাপ-আলোচনার আসরে তার অমন বোবা ও গোমড়া মুখ কেন? না কারো বিয়ের গল্প, কি সিনেমার গল্প, কি এমনি গালগল্প, কুৎসা, নিন্দা, রাজনীতি, সাহিত্য— না, হরিদাস এইসব কিছুরই চৌহদ্দির বাইরে। এমনকি চোখে-মুখে পর্যন্ত ভাবান্তর নেই, সমাজ-সংসারের বহু উর্ধ্বে, একেবারে নির্লিপ্ত। যেন সে পাথর হয়ে গেছে।

কিংবা অন্ধ, বোবা, বধির। কিন্তু একবার শুধু দাঙ্গা আর খুনের গল্প উঠিয়ে দাও, তারপর দেখ—ঘৃণা আর ক্রোধের লেলিহান আগুনের ঝলকে ওর চোখ দুটো উঠেছে জ্বলে। নির্বাক হরিদাসের অগ্নিভয়ঙ্কর চোখজোড়া তখন যেন লড়াইয়ের হাঁক দেয় :

প্রতিশোধ!

প্রতিশোধ!!

প্রতিশোধ!!!

পাঞ্জাব বিভাগের সময় হরিদাস ছিল লায়ালপুরের একজন ডাকসাইটে উকিল। তখন কেবল বিভক্ত পাঞ্জাবের টুক্‌রো দুটোকে নৃশংস ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের অগ্নিশ্রাবী কড়াইয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। লায়ালপুরের বাস্তুত্যাগীরা বলেছে, দাঙ্গায় হরিদাসের গোটা পরিবারটাই খুন হয়ে গেছে। তারপর কেটে গেছে লম্বা দশ মাস। কাল নাকি সর্বদুঃখহরা। সেই মারাত্মক স্মৃতিও ধীরে ধীরে আবছা হয়ে এসেছে। তাছাড়া সঠিক কেউ জানতও না কীভাবে তার স্ত্রী আর কন্যা মারা গেছে। আরও হাজার হাজার জনের মতো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, না গৃহদাহে, না খুনখোর ছুরির আঘাতে। হরিদাস কাউকে বলেনি সে-কথা।

হরিদাস পাগল হয়নি; অথচ মাঝে মাঝে পাগল হবার ইচ্ছাই তাকে পেয়ে বসে। তাহলে সবকিছু ভুলে যাওয়া যেত। হৃদয়বিদারী ভয়াবহ স্মৃতির অহর্নিশ নিপীড়ন অসহ্য—কীভাবে বাড়ি লুঠ হল, কীভাবে তার স্ত্রী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরল, কীভাবে প্রতিবেশী-বন্ধুরা নিহত হল—এইসব। সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে কন্যা জানকীর স্মৃতি। উঃ, ঘিলুতে কী যেন কামড়াতে থাকে। মনের পর্দায় মর্মান্তিক ছবিগুলো ভেসে ওঠে বিশৃঙ্খলভাবে।

সেইসব ছবি। সুন্দর ছবি। ভয়ঙ্করও বটে।

জানকী, সতেরো বছরের জানকী। মায়ের বুকের ধন, বাপের চোখের মণি।

গোলাপের পাপড়ির মতো কোমল গায়ের রঙ। আর চোখ, নার্গিস ফুল কোথায় লাগে! ছিপছিপে লতিয়ে ওঠা দেহবল্লরী। ভয় হয় মৃদুতম স্পর্শেই কুঁকড়ে যেতে পারে। গোটা লায়ালপুরে সবচেয়ে সুন্দরী, সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়ে জানকী।

মুখখানা কী চমৎকার! সারল্যের প্রলেপ রয়েছে তার ওপরে।

পাশাপাশি আরেকটা ছবি ঝিলিক মেরে ওঠে।

কয়েকটি কুৎসিত ভয়াবহ মুখাবয়ব। চোখে পাশব কামনার সর্বধ্বংসী অগ্নিশিখা। ওষ্ঠের কুঞ্চনে শয়তানের নারকীয় হাসি।

সূর্যালোকে চকচক করছে ছুরির শাণিত ধার। বন্দুকের অদৃশ্য কালো কালো চোখ দ্যুতিময়তায় জ্বলছে। সেই ভয়ঙ্কর মুখগুলো এগিয়ে আসে জানকীর দিকে ভয়ঙ্করের পদক্ষেপ ফেলে।

এখনও, দশমাস পরেও, হারিদাস নিজের অনুনয়-ভারাক্রান্ত কাতর ভিক্ষা প্রার্থনার প্রতিধ্বনি শুনতে পায়।

: মার আমাকে, মেরে ফেল—শুধু—শুধু আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও। ফের এগিয়ে আসে ওরা জানকীর দিকে। বিভীষিকার কালো কালো ছায়া-রঙ ওদের মুখে।

: আমি মুসলমান হতে রাজি আছি। আমার মেয়েও হবে। শুধু দয়া কর, দয়া কর—ওকে বাঁচাও।

নৃশংস বিকট মুখগুলোতে কোনোরকম কারুণ্যের ছায়া নেই। কামনা-ভয়ঙ্কর চোখগুলো জানকীর দিকে এগোতে থাকে। গোখরো সাপ যেন এগোচ্ছে সম্মোহিত শিকারের দিকে।

: আমার মেয়ের কচি বয়স ও সুন্দরী। দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা যে কেউ ওকে মুসলমান করে বিয়ে কর, কেবল জীবনটা নিয়ো না।

একটা মুখ। এতগুলো ভয়াবহ মুখের ভেতরে সেটা আরও ভয়ঙ্কর। হলদে ময়লা দাঁত, চোখ-ভরা বিকট কামনা। ক্ষুধার বিশ্বগ্রাসী দাবানল। উল্লাসে আর উত্তেজনায় ঘন কালো দাড়ি কাঁপছে তার। তার মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরেই জানকীর ফুলের মতো সৌন্দর্য। পরমুহূর্তে হরিদাসের দৃষ্টি আবছা হয়ে আসে। প্রেতায়িত কালো মেঘ যেন চাঁদ ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু বর্বরের পাশব আক্রমণে জানকী গুঁড়িয়ে যাবার আগেই হরিদাসের দৃষ্টি আটকে যায়।

জানকীর চোখে ছড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত ভীতি-ব্যাকুলতার ছায়া। ভীতি, ঘৃণা, অসহায়তা, নৈরাশ্য, নিষ্ফল করুণা ভিক্ষা—সবকিছু মিশিয়ে। সামনেই বাপকে বাঁধা হয়েছে একটা গাছের সঙ্গে। মেয়ের ইজ্জতহানি স্বচক্ষে দেখবার জন্যেই তাকে রাখা হয়েছে জিইয়ে। বীভৎস সে দৃশ্য। অসহ্য! হরিদাসের চোখের পাতা মুদে আসে।

স্মৃতির পর্দায় দৃশ্যটা ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। হায়, কান দুটোও যদি একেবারে বধির হয়ে যেত। তাহলে তো ঐ মর্মভেদী বিকট আর্তনাদ শুনতে হত না। শুনতে হত না গায়ের কাপড় নির্দয় হাতে ফড়ফড় করে টেনে ছেঁড়ার শব্দ, শয়তানটার কামার্ত নিঃশ্বাসের ভারি শব্দ, জানকীর মরণ চিৎকার, গোঙানি, কান্না। এখনও সে-সব কানে বাজে।

এমনকি মনের এতগুলো পাতা ডিঙিয়েও সেই ভয়ানক মুখগুলো একটার পর একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ... পরপর মুখগুলো ভেসে উঠছে যতক্ষণ-না সেই অসহায় কান্নাকে মৃত্যুর স্তব্ধতা শুষে নেয়। এ স্তব্ধতা আরো ভয়ঙ্কর, রক্ত ঘনতায় জমাট বাঁধা আর্তনাদের চেয়েও। তারপর সে চোখ খোলে...

ফুলের মতো জানকীর মুখখানা। ফুলটা যেন মাড়িয়ে নিষ্পিষ্ট করে দেয়া হয়েছে মাটির সঙ্গে। বিবর্ণ, সৌরভচ্যুত, প্রাণহীন ফুল। আলুলায়িত কেশসম্ভারে অত্যাচারের বিশৃঙ্খলা। কপোলতটে নৃশংস দংশনের স্পষ্ট গভীরতা। ক্ষতমুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে ফিনকি দিয়ে।

মৃত পাণ্ডুর মুখে যেন রুজের রক্তিম লালিমা। গারের পাপড়িরাঙা চামড়া কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। নিষ্ঠুর ধারাল দাঁতের আঘাত স্পষ্ট। সমস্ত শরীরের ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

গাল, কান, নাক এমনকি খোলা বুক থেকেও। জন্মের মতো, হ্যাঁ, যতদিন বাঁচবে ততদিনের জন্য হরিদাসের মনের ক্যানভাসে শয়তান রক্তের আখরে এঁকে দিয়েছে এ ছবিখানা। এ ছবি চির-অম্লান। কিছুতেই ভুলবার নয়। অসম্ভব!

নিজের হাতে হরিদাস সাজিয়েছে মেয়ের চিতা। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে জানকী। অগ্নিদেব তার কোমল, সুন্দর দেহ-নৈবেদ্য গ্রহণ করেছেন। পবিত্র নিষ্পাপ দেহনির্মাল্য। আহত, অপমানিত, ধর্ষিত সে দেহ। হরিদাস এখনও সেই চিতার অগ্নিশিখা দেখতে পায়। শিখাগুলো নাচছে তার চোখের সামনে। লাল আর হলুদ ঊর্ধ্বমুখী শিখা। তার মনে হয়েছিল জানকীর নয়, হিন্দুস্থানের ইজ্জত দাহ করা হচ্ছে। চিতাগ্নিশিখার সঙ্গে মানবতা উবে যাচ্ছে। সৌন্দর্য, দয়াধর্ম আর সহানুভূতি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

চিতার আগুন একসময়ে নিভল। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হরিদাসের মনে। এ আগুন নিভবার নয়। না... না... কখনো না... অন্তত... যতদিন-না হরিদাস প্রতিশোধ নিতে পারে একটি মুসলমান মেয়ের নগ্ন বুকে ছুরিকাঘাত করে। তাই হরিদাস বেঁচে রয়েছে এখনো। একবার, শুধু একবার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে তার পরমুহূর্তেই মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরবে সে।

প্রতিশোধ!

প্রতিশোধ!!

কোটের নিচে ধারাল ছুরি লুকানো রয়েছে। কিন্তু কোথায় সুন্দরী মুসলমান মেয়ে? জিঘাংসু হরিদাসের অতৃপ্ত আত্মা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। দিল্লির মুসলমানদের অনেকে দাঙ্গায় নিহত হয়েছে। কেউ কেউ পাকিস্তানে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। যারা এখনও রয়ে গেছে, তারা তো পথে বেরোতেই সাহস করে না। কাপুরুষ কোথাকার, ভীতুর দল!

ভাগ্য হরিদাসের সঙ্গে অদ্ভুত খেলা শুরু করেছে। বাস্তুত্যাগী পুনর্বসতি সাহায্য তহবিল থেকে সে তিনশ' টাকা পেয়েছে। এত টাকা দিয়ে কী করবে? কেউই তো নেই আর—না গৃহ, না পরিবার। আহার-পরিচ্ছদের দরকার নেই। এমনকি বাঁচবার পর্যন্ত ইচ্ছে নেই। কী করবে হরিদাস অত টাকা দিয়ে! ভাবতে ভাবতে নয়াদিল্লি আর পুরনো দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে সে।

কনট প্লেস থেকে চাঁদনি চক। চাঁদনি থেকে জামে মসজিদ। মসজিদের সরু সরু মিনার। সাদা গম্বুজের ওপর নজর পড়লে ফের জেগে ওঠে প্রতিহিংসার সঙ্কল্প। মুসলমানদের বিরুদ্ধে, গোটা মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে। জামে মসজিদ থেকে দরিয়াগঞ্জ—তারপর রাজঘাট। এমনকি রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিও তার মন থেকে প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা নির্বাপিত করতে পারে না।

গান্ধীজী মহাত্মা ছিলেন। ঋষি। কিন্তু আমি যে সাধারণ লোক। তিনি পারেন শত্রুকে ক্ষমা করতে, আমি পারি না।

সেখান থেকে এডওয়ার্ড পার্ক। পার্কে রাজার পাথরের মূর্তি। ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে।

: বাহ্, হুজুর বাহ্। চলে তো গেলে, এদিকে আমাদের ঠেলে দিলে এক মৃত্যুঘাতী দুর্দশায়।

ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা অচেনা জায়গায় এসে পড়ল। তারই মতো অসংখ্য বাস্তুত্যাগী ঘুমোচ্ছে পাকা রাস্তার ওপর। বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে ভারি তীব্র গন্ধ। সেন্ট, ঘাম, ভ্যাপসা মাটি, প্রস্রাব, ফুল, ফিনাইল, পেট্রোলের গন্ধ। বাঁ ধারে একসার দোকান। মিঠাইয়ের দোকান, দুধের দোকান। হোটেল এখনও খোলা রয়েছে। বাকিগুলো বন্ধ। প্রতিটি পথিকের দৃষ্টি একতলার আলোকিত ব্যালকনিতে নিবদ্ধ। আলোয় উজ্জ্বল রশ্মিতে আমন্ত্রণের পত্ররেখা। বায়ুতরঙ্গের ছন্দে সঙ্গীত ঝঙ্কার। জায়গাটা?

: বাবুজি!

আচমকা সম্বোধন। একটা লোক, তার তির্যক দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

: বাবুজি হুকুম করেন তো খাশা চিজ দেখাতে পারি।

কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না-পেরে হরিদাস এগোতে থাকে। কিন্তু লোকটা এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

: খুশি না-হলে আপনার বখশিসের সব পয়সা হারাম।

কথার আবছা অংশ পরিষ্কার হয়ে গেল তার মুখের ইঙ্গিত থেকে।

: ভাই আমি একজন বাস্তুত্যাগী। হরিদাস বলল।

: আমিও তাই বাবুজি। আমরা তো একই দলের, আসুন-না আমার সাথে, একটা মুসলমান মেয়ে আছে...। পাকিস্তানের খেসারত নেবার এই তো সুযোগ, পাকিস্তানি হুর ভোগ করার সুযোগ।

মুসলমান মেয়ে! পাকিস্তানি হুর!!

প্রতিহিংসার লাল আর হলদে শিখা হরিদাসের চোখের সামনে নাচছে প্রেতায়িত নাচ। যেতে যেতে লোকটা আপনা থেকেই বলতে লাগল, বাবুজি, এমন মেয়ে হাজারেও একটা মেলে না। বয়েস কতই-বা হবে—বড়জোর সতের কি আঠারো।

তারপর এদিক-ওদিক ইতস্তত তাকাতে তাকাতে ফিসফিস করে বলল, আমরা ওকে জলন্ধর থেকে নিয়ে এসেছি। মশহুর লোকের মেয়ে। কী বলব বাবুজি-ওকে রাজি করিয়ে ব্যবসায়ে নামাতে পাক্কা দশ মাস সময় লেগেছে।

জানকীরও কি একই বয়েস ছিল না? জানকীও কি নামজাদা লোকের মেয়ে নয়? তবু সেই বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখগুলো একবর্ণ দয়াও দেখায়নি। এক দুই তিন চার পাঁচ...যতক্ষণ পর্যন্ত-না অনাঘ্রাত পবিত্র ফুলটা মাটির সঙ্গে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে।

: তাহলে আমিই-বা কেন দয়া দেখাতে যাব? হরিদাস ভাবল। তার হাত কোটের ভেতরে রাখা ছুরিটা একবার ছুঁয়ে এল।

বেশ্যাবাড়ির সাধারণ বৈঠকখানা। মেঝেতে ময়লা সাদা চাদর বিছানো। সিলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দেয়ালে শস্তা তৈলচিত্র টাঙানো। ভগবান কৃষ্ণ, রাজা রামচন্দ্র, সতী সীতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু। দুটো বড় বড় আয়না। ঘরের এককোণে বসে পান তৈরি করছে স্থূলকায়া কুৎসিৎ একটা প্রৌঢ়া। মুখে ব্রণের দাগ। সমস্ত কিছুর ওপরে তার বিচক্ষণ দৃষ্টি। বাজনার যন্ত্র, গায়ক আর বাজনদারদের মাঝখানে রয়েছে সেই পাকিস্তানি হুর। গান গাইছে সে।

হরিদাস হুর দেখেনি কখনো, কিন্তু শুনেছে চেহারার বিবরণ। মেয়েটি হুরই বটে! গায়ের রঙ জানকীর চেয়েও সুন্দর, তবে রক্তহীনতার বিবর্ণতা স্পষ্ট। দেহসৌষ্ঠবে মঞ্জুরিত লতার কৃশতা আর সৌকুমার্য। কালো আয়ত চোখ। তবে এ চোখে সুস্থতার জ্যোতি বা জীবনের ছায়া নেই। যেমনটি জানকীর ছিল। তার বদলে নৈরাশ্যের অন্ধকার প্রকাশমান।

হরিদাস দেখছিল মেয়েটি গাইছে, কিন্তু কানে বিন্দুবিসর্গ গানের বুলিও ঢুকছে না। ঘর বোঝাই শ্রোতা। হরিদাসের চোখ এ জনতার অস্তিত্ব অনুভব করছে। কিন্তু তারা কি ধনী, না দরিদ্র, ভদ্রলোক, না বদলোক এ স্তরবিন্যাস বুঝবার মতো দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা চোখে নেই। এক কোণায় ঘুপটি মেরে বসে সে গভীরভাবে তাকিয়ে ছিল পাকিস্তানি হুরটির দিকে। সে দৃষ্টিতে কামনার লাম্পট্য ছিল না। কেবল প্রতিহিংসার লাল আর হলুদ শিখা কাঁপছে।

লোকটা বলেছিল মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তখন ঘর ফাঁকা হয়ে যাবে। গোটা রাতের জন্যে দর ঠিক হয়েছে দু'শ' টাকা। মাত্র দু'শ'। বাকি টাকা তাহলে কী করবে! বাকি টাকার দরকার আর নেই। পরের দিন বাঁচবার আর কোনো ইচ্ছেই নেই তার। আজকেরটাই জীবনের শেষ রাত। কাল থেকে সে মুক্ত। সবকিছু থেকে মুক্ত। টাকা-পয়সা, দৌলত, প্রতিশোধ, জীবন, সবকিছু থেকে। দশ টাকা করে একশ' টাকাই মেয়েটাকে বখশিস দিয়ে দিল। পায়ের কাছ থেকে দশ টাকার নোট কুড়িয়ে নেবার সময় মেয়েটা প্রতিবার তাকে সালাম করল। যাক, এতেও বিক্ষুব্ধ মন কিছুটা অন্তত সান্ত্বনা পাচ্ছে! একটি মুসলমান মেয়েকে এভাবে অপমান করে হরিদাস অন্তত এটুকু ভাবতে পারছে যে তার অপমানিতা মেয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু এ তো সামান্য মাত্র!

নিষ্পলক স্থির চোখে হরিদাস মেয়েটির প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছিল মেয়েটি জাত ব্যবসায়ী নয়। ওর সব অঙ্গভঙ্গিই যান্ত্রিক। অনুভূতিহীন। নগ্নবাহু দুলিয়ে গানের সঙ্গে অপাঙ্গদৃষ্টি ছুড়ে ব্যবসার কায়দা প্রদর্শন ওর অপটুতাই ধরিয়ে দিচ্ছিল। দম-দেয়া ঘড়ির মতো মেয়েটা। হরিদাসের সারা শরীরে একটা ভৌতিক রহস্যময় অনুভূতি কিলবিল করে বয়ে গেল মুহূর্তে। মনে হল, এ জীবন্ত মানুষ নয়। একটা মড়ার দেহ জাদুকরের মায়ায় কেমন করে যেন সাময়িক জীবন পেয়েছে।

আর-একটা জিনিস নজরে পড়ল। টাকা বখশিস দেয়ার অছিলায় যখনই কেউ ওকে ছুঁতে চেষ্টা করছে তখুনি মেয়েটা ছিটকে প্রসারিত হাত সরিয়ে নিচ্ছে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো! আশ্চর্য, মুখে কিন্তু তার এই অনিচ্ছার কোনো ভাবান্তরই নেই। রোষ কি বিরক্তি কিছুই নয় টাকা-নোট যা কিছুই পাচ্ছিল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছিল ঘরের কোণায়। সেখানে বসেছিল স্থূলকায়া প্রৌঢ়াটি। এ অবহেলা প্রৌঢ়ার মুখে দাগ কাটেনি। কিন্তু টাকাগুলো ছুঁড়ে দেবার সময়কার কব্জির ঝাঁকুনিতে অসহ্য ঘৃণার প্রকাশ স্পষ্ট। মেয়েটি যেন বলতে চাইছিল—

: নাও টাকা, নাও, যে টাকার জন্যে এই বাজারে আমায় বিক্রি করছ। এই নাও, তারপর রেহাই দাও আমাকে। নাও...নাও... খুশি হও।

ওর নিপীড়িত নিরীহতা কেমন করে যেন হরিদাসের মনে ভাবান্তর সৃষ্টি করল। হরিদাসের স্থির বিশ্বাস জন্মাল, মেয়েটির জন্ম ভদ্র, ধনী মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে। পরিষ্কার

সুস্পষ্ট সুরজ্ঞান আর উচ্চারণভঙ্গিতে সুশিক্ষার পরিচয় প্রকাশমান। মোটমাট জানকীর ইজ্জতহানির প্রতিশোধ নেয়ার উপযুক্ত পাত্রই বটে।

রাত দুপুর হল। একে একে সবাই চলে গেল। মেয়েটিও চলে গেল শোবার ঘরে। এমনকি একবারও তাকাল না হরিদাসের দিকে, ওর বাকি রাতের একমাত্র খদ্দের। হরিদাস সেই লোকটাকে দু'শ' টাকা দিয়ে ওঠাল। লোকটা টাকাগুলো চালান করল কুৎসিৎ চেহারার প্রৌঢ়া বাড়িউলির কাছে। প্রৌঢ়া টাকাগুলো দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর নিচে। তারপর খুশি হয়ে দশ টাকার একটা নোট তুলে দিল লোকটার হাতে। লোকটা সালাম করে চলে গেল। ময়লা, পায়োরিয়ায় খাওয়া বিচ্ছিরি দাঁত বের করে প্রৌঢ়া চোখ টিপে হরিদাসকে বলল—

: বাবুজি, এবার যান ভেতরে। তবে একটু সাবধান। মেয়েটা নতুন কি না—আপনি তো জানেন সবকিছু।

পরমুহূর্তে হরিদাস ঢুকে পড়ল ঘরে।

সতর্কতার সঙ্গে ভালো করে দরজার আগল লাগাল সে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বসেছিল খাটের উপরে চিন্তাকুলভাবে। হরিদাস এগোল সেদিকে। হরিদাসকে দেখেই মেয়েটি সম্ভ্রমসহকারে উঠে পড়ল। দৃষ্টি মেঝেয় নিবদ্ধ। তারপর জুতোর ফিতে খুলে দিতে বসল। হয়তো এই হুকুম ছিল বাড়িউলির।

: ছেড়ে দাও—

কর্কশস্বর হরিদাসের কণ্ঠে। পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসা একটা মুসলমান মেয়েকে দেখে বেশ তৃপ্তি বোধ করছে সে।

: গায়ের কাপড় সরাও—

কম্পিত হাতে মেয়েটি শাড়ি খুলে ফেলল। কেবল রইল পেটিকোট আর ব্লাউজ।

: এগুলোও—

অসহায় লজ্জায় ও দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। ... পেটিকোটটা ঝুপ করে মাটিতে খসে পড়ল। হরিদাসের হাত পকেটের ছুরির ওপর।

: তোমাকে সম্পূর্ণ ন্যাংটো দেখতে চাই। বুঝেছ? ... এখানো হয়নি। দু'শ' টাকা নগদ দিয়েছি তার জন্যে।

মেয়েটি মুখ ফেরাল। চোখে অব্যক্ত ভিক্ষার নিদারুণ কারুণ্য। আশা ঐ মধ্যবয়সী খদ্দেরটার যদি দয়া হয়। হয়তো তার মনে দয়া হতে পারে, ওর সম্পূর্ণ নগ্নতার ওপরে জেদ না-ও করতে পারে।

: জলদি কর—হরিদাস গর্জে উঠল নির্দয়ভাবে। আমার সময় নেই।

পকেটের ভেতরে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে তার হাত। মেয়েটি সুইচের দিকে এগোবার চেষ্টা করল।

: না—পথরোধ করে দাঁড়াল হরিদাস।

: অন্ধকার নয়—

জানকীর কী হয়েছিল? খোলা রাস্তার ওপরে দিনের আলোয় কি তার ইজ্জতহানি করা হয়নি?

ব্লাউজ খুলল মেয়েটি। সুগঠিত স্তনযুগলের যৌবন-রেখার স্পষ্টতা ঢাকা রয়েছে কাঁচুলির তলায়।

: এটাও...

ছুরি প্রস্তুত। আবার মেয়েটি তাকাল তার দিকে। চোখে করুণ ভিক্ষার আবেদন।

এইভাবেই জানকী তাকিয়েছিল হৃদয়হীন পশুগুলোর দিকে। কিন্তু তারা কণামাত্র দয়াও দেখায়নি। না, হরিদাসও দেখাবে না।

হাতের আঁজলা দিয়ে মেয়েটি মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল স্তনের ওপর।

হরিদাসের ডান হাতে ঝকমক করে উঠল ছুরিটা, মৃত্যু আঘাত হানতে উদ্যত। অপর হাতে মেয়েটির হাত দুটো হিঁচড়ে নামাল মুখ থেকে। ও দেখুক হরিদাস কী করতে যাচ্ছে। জানকীও তো দেখেছে। এই মুহূর্তটির জন্যেই তার দীর্ঘ দশ মাসের অধীর প্রতীক্ষা। লাল আর হলুদ শিখা নাচছে উল্লাসভরে।

হরিদাসের এক হাতে উদ্যত ছুরি আর অপর হাত পাশব ভঙ্গিতে বুকের কাঁচুলির দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। করুণ, তীব্র, মরণ আর্তনাদ। চোখে মৃত্যুভীতির গাঢ় ছায়া।

হরিদাস দেখল সে চোখে আরও কিছু আছে—ভীতির সঙ্গে ঘৃণা আছে। করুণা ভিক্ষার আবেদন স্পষ্ট, আর রয়েছে সম্পূর্ণ অসহায়তা। ঠিক জানকীর চোখের দৃষ্টি। কিন্তু তবু সে দৃষ্টি জানকীকে বাঁচাতে পারেনি। বিদ্যুৎচমকের ক্ষিপ্রতায় হরিদাসের বাঁ হাত স্পর্শ করল মেয়েটির কাঁচুলি। এ কি, কাঁচুলি এত ভারি ঠেকছে কেন? তবু হ্যাঁচকা টান মারল কাঁচুলিটায়। আর এর সঙ্গে...

ছুরিটা শূন্যেই উদ্যত হয়ে রইল। লজ্জায় হরিদাস চোখ ফেরাল। মাত্র একটি কথা শব্দ হয়ে ফস্‌কে বেরিয়ে এল তার নিবদ্ধ ঠোঁট দুটোর কাছ থেকে :

'বেটি!'

কাঁচুলির নিচে যেখানে সে ছুরির আঘাত করতে যাচ্ছিল সেখানে দেখল স্তন দুটো নেই। মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সেখানে কিছুই নেই...কিছুই নেই...

মা

কুদরতুল্লাহ শাহাব

মায়ের জন্মতারিখ সঠিক জানা যায়নি।

যে সময় লায়ালপুর জেলায় নতুন আবাদি বসেছিল, পাঞ্জাবের প্রত্যেক গাঁও থেকে ভূমিহীন লোকেরা জমি পাওয়ার আশায় এই নতুন কলোনির দিকে দলে-দলে ছুটে এসেছিল তখন। সাধারণ লোকেরা তখন লায়ালপুর এবং সারগোদা প্রভৃতি অঞ্চল 'বার' এলাকা নামে চিনত। সে সময়ে মায়ের বয়স ছিল দশ-বারো বছর। এই হিসাবে মায়ের জন্মতারিখ গত শতাব্দীর শেষভাগের দশ-পনেরো বছরের যে-কোনো এক সময়ে হয়ে থাকবে।

মায়ের বাপের বাড়ি আম্বালা জেলার রুপোড় মহকুমার মেনিলা গ্রামে। সেখানে তাদের কিছু জমি-জমা ছিল। তখন রুপোড়ে শতদ্রু থেকে সেরহিন্দ খাল খনন করা হচ্ছিল। নানাজির জমি পড়ে গেল সেই খালের মধ্যে। রুপোড়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দফতর থেকে এ-সব জমির ক্ষতিপূরণ দেয়া হত। নানাজিও দু'-তিনবার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য শহরে গেলেন; কিন্তু সোজা লোক ছিলেন তো, জানতেন না কর্তার দফতর কোথায় আর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হলে কী করতে হয়। শেষে খোদাকে শোকর জানিয়ে চুপ করে বসে রইলেন এবং খাল খননে মজুরের কাজ করতে লাগলেন।

এই সময়ে খবর পাওয়া গেল যে, বার এলাকায় নতুন আবাদি হচ্ছে আর বিনামূল্যে জমি দেয়া হচ্ছে নতুন বসতি স্থাপনকারীদের। নানাজি তাঁর স্ত্রী, দুটো ছোট ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে লায়ালপুর রওনা হলেন। যানবাহনের সংস্থান ছিল না, তাই হেঁটেই চললেন।

পথ চলতে কায়িক পরিশ্রম করে পেট চালাতেন। পথে যেতে-যেতে নানাজি এখানে ওখানে কুলির কাজ করতেন কিংবা কারো কাঠ কেটে দিতেন। নানি আর মা কারো সুতো কেটে দিতেন অথবা বাড়ির উঠান, ঘরের দেয়াল লেপে দিতেন। লায়ালপুরের সোজা পথ কারো জানা ছিল না। তাই ঘুরে-ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করে দিনের পথ সপ্তায় অতিক্রম করে চললেন তারা। অবশেষে দেড়-দু'মাস চলার পর তারা জিরানওয়ালায় পৌঁছলেন। একে পায়ে হেঁটে চলা, তার ওপর দৈহিক পরিশ্রম সব মিলে সকলেরই শরীর নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। পা ফুলে উঠেছিল কারো-কারো। ফলে কয়েক মাস তারা এখানে থাকলেন। নানাজি সারাদিন শস্যের গুদামে বস্তা বইতেন, নানি চরকায় সুতো

কেটে বিক্রি করতেন। আর মা চালাতেন সংসার—যে সংসার একটা ছোট কুঁড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন।

বকরা ঈদের উৎসব এল। নানাজির কাছে টাকা জমেছিল কিছু। তিনি মাকে তা থেকে তিন আনা পয়সা দিলেন। ঈদের উপহার। জীবনে মা এই প্রথম হাতে এত পয়সা পেলেন; অনেক ভাবলেন তিনি। কিন্তু এই পয়সা খরচ করার কোনো উপায় বের করতে পারলেন না। দিনে এক-আধটা রুটিনুন-লঙ্কার চাটনি দিয়ে খাবার ব্যবস্থা থাকলে অতিরিক্ত পয়সার আর দরকার কী? এই প্রশ্নের জবাব সারা জীবনেও মা খুঁজে পাননি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আশি বছরেরও বেশি হয়েছিল। কিন্তু তখনো একশ' টাকা, দশ টাকা এবং পাঁচ টাকার নোট তিনি ঠিক চিনে উঠতে পারতেন না।

ঈদ উপলক্ষে পাওয়া তিন আনা পয়সা কয়েকদিন পর্যন্ত মায়ের ওড়নার কোণায় বাঁধা রইল। যেদিন জিরানওয়ালা থেকে বিদায় হলেন সেদিন মা এগারো পয়সার তেল কিনে মসজিদের চেরাগে ঢেলে দিয়ে এলেন। বাকি পয়সাটা রাখলেন নিজের কাছে। এরপর যখনই তাঁর কাছে পুরো এগারো পয়সা হত অমনি তিনি তেল কিনে পাঠিয়ে দিতেন মসজিদে। জীবনভর তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই নিয়ম পালন করে গেছেন। ক্রমে অনেক মসজিদে বৈদ্যুতিক আলো এল। কিন্তু লাহোর ও করাচির মতো শহরেও কোনো কোনো মসজিদের তেলের প্রদীপ জ্বলত সেকথা জানা ছিল তাঁর। মৃত্যুর রাতেও তাঁর শিয়রে মলমলের রুমালে বাঁধা ছিল কয়েক আনা পয়সা! সম্ভবত এগুলোও তিনি কোনো মসজিদে তেল দেয়ার জন্য রেখেছিলেন। যেহেতু সে রাতও বৃহস্পতিবারের রাত ছিল।

এই কয়েক আনা ছাড়া মায়ের কাছে আর কোনো টাকা-পয়সা বা গয়না ছিল না। সংসারের আসবাবপত্রের মধ্যে যা ছিল তা অতি সামান্য। তিন জোড়া সুতি কাপড়, এক জোড়া দেশি জুতো, এক জোড়া রবারের চপ্পল, একটা চশমা, একটা আংটি—তাতে তিনটে ছোট-ছোট ফিরোজা বসানো, একটা জায়নামাজ, একটা তসবিহ আর বাকি আল্লাহ্ আল্লাহ্।

তিন জোড়া পরিধেয় তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে রাখতেন সব সময়। এক জোড়া তিনি পরতেন, দ্বিতীয় জোড়া ধুয়ে বালিশের নিচে ভাঁজ করে রাখতেন, যাতে চাপ খেয়ে ইস্তিরি হয়ে যায়। তৃতীয় জোড়া ধোয়ার জন্য তৈরি থাকত। যদি চতুর্থ জোড়া তাঁর কাছে আসত কখনো—তিনি সেটা গোপনে কাউকে দিয়ে দিতেন। তাই সারাজীবনে তাঁর স্যুটকেসের কোনো প্রয়োজন হয়নি। যত দূরের যাত্রা হোক-না কেন, তাঁর তৈরি হতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগত না! কাপড় পুটুলি করে জায়নামাজ দিয়ে পেঁচিয়ে রওনা হয়ে যেতেন। শীতে গরম চাদর আর গ্রীষ্মে মলমলের পাতলা ওড়না—এই নিয়েই যেখানে খুশি যেতেন তিনি। জীবনের শেষ যাত্রাও তিনি সাদাসিদেভাবেই সম্পন্ন করেছেন। ময়লা কাপড় নিজহাতে ধুয়ে বালিশের নিচে রেখেছেন তিনি, নেয়ে-ধুয়ে চুল শুকিয়েছেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই জীবনের সবচেয়ে শেষ ও সবচেয়ে লম্বা সফরে রওনা হয়ে গেছেন। যেমন নীরবতার সঙ্গে এই দুনিয়ায় বাস করতেন তেমনি নীরবেই তিনি পরপারে রওনা হয়েছেন। সম্ভবত

এজন্যেই তিনি প্রায়ই প্রার্থনা করতেন, 'আল্লা, হাত-পা সচল থাকতে উঠিয়ে নিও। আল্লা, কখনো কারো মুখাপেক্ষী আমায় করো না।'

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি কাপড়-চোপড়ের চেয়েও সরল ও নিরাসক্ত ছিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য ছিল মকাই-এর রুটি ও ধনে বা পুদিনার চাটনি। আর সব খাবারও আনন্দের সঙ্গে খেতেন; প্রায় প্রতি গ্রাসেই তিনি আল্লার শুকরিয়া আদায় করতেন। কেউ ফল খাওয়ানোর জন্য খুব জেদ করলে, তিনি কোনো-কোনো সময় কলার কথা বলতেন। তবে নাশতার সময় দু'পেয়ালা চা এবং বিকেলবেলা এক পেয়ালা লাল চা তাঁর চাই। একবার মাত্র খাবার খেতেন তিনি—তা-ও বেশিরভাগ দুপুরবেলা—রাতের বেলা প্রায় খেতেনই না। গরমের দিনে সাধারণত মাখন-তোলা দুধের হাল্‌কা লোনা লাচ্ছির সঙ্গে এক-আধটা চাপাতি তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। কাউকে আগ্রহের সঙ্গে কোনো কিছু খেতে দেখলে খুব খুশি হতেন তিনি। সব সময় দোয়া করতেন। সকলের ভালো হোক—সকলের পরে আমারো ভালো হোক। নিজের জন্য বা নিজের সন্তানের জন্য তিনি সোজাসুজি কোনো প্রার্থনা করতেন না। প্রথমে অপরের জন্য দোয়া করতেন, তারপর খোদার সৃষ্ট জীবসমূহের সুখ-সমৃদ্ধি কামনার মাধ্যমে নিজ সন্তান বা আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল কামনা করতেন। নিজ পুত্র-কন্যাদের তিনি, কখনো 'আমার ছেলে' বা 'আমার মেয়ে' বলতেন না—সব সময় তাদের বলতেন আল্লাহ্‌র দান।

কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো মায়ের কাছে খুব কঠিন মনে হত। নিজের সব কাজই তিনি নিজ হাতে করতেন—যদি কোনো চাকর-বাকর এসে জবরদস্তি করে তাঁর কাজ করে দিত, তাহলে এক অভূতপূর্ব লজ্জা আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সমস্ত দিন দোয়া করতেন তাকে।

সরলতা ও তিতিক্ষার এই বৈশিষ্ট্য কিছুটা প্রকৃতিগতভাবেই মায়ের চরিত্রে ছিল, কিছুটা এসেছিল জীবনের ঘাত-সংঘাত থেকে।

জিরানওয়ালায় কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি যখন তাঁর বাপ-মা ও ছোট ভাইদের নিয়ে জমির খোঁজে লায়ালপুর রওনা হলেন, তখন তাঁদের জানা ছিল না যে, তাঁদের কোথায় যেতে হবে এবং জমি পেতে গেলে কী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মা বলতেন, সেকালে তাঁর মনে কলোনির কল্পনা একজন ফেরেশতা স্বভাবের মহাত্মার চিত্র হয়ে ভেসে উঠত, যিনি উঁচু বেদীর উপর বসে জমি-জিরাত বণ্টন করছেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ছোট্ট কাফেলাটা লায়ালপুর এলাকায় ঘুরে বেড়াল; কিন্তু কোনো পথচারীর চেহারায় কলোনির মহাত্মাসুলভ চিত্র ফুটে উঠল না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ৩৯২ নম্বর চকে—সে সময় সেখানে নতুন আবাদি বসছিল—ডেরা ফেলল তারা। দলে-দলে লোক এসে সেখানে ঘর বাঁধছিল—নানাজি তাঁর সোজা বুদ্ধিতে বুঝলেন যে, কলোনিতে বসবাস করবার হয়তো এটা একটা নতুন নিয়ম। সুতরাং তিনি খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে ঘাসপাতা দিয়ে একটা কুঁড়ে তৈরি করে ফেললেন এবং পতিত দেখে এক টুকরো জমি খুঁজে নিয়ে চাষ করবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। সেই সময়ই রাজস্ব বিভাগের একজন কর্মচারী পর্যবেক্ষণের জন্য এসে দেখলেন যে, নানাজির কাছে এলটমেন্টের দলিলপত্র নেই। ফলে তাঁকে চক থেকে বের করে দেয়া হল : অধিকন্তু

সরকারি জমিতে বে-আইনিভাবে কুঁড়েঘর বানানোর জন্য তাঁর বাসন-কোসন ও বিছানা-পত্র ক্রোক করা হল। কর্মচারীদের একজন মায়ের কানের দুটো রুপোর বালি খুলে নিয়ে গেল। একটা বালি খুলতে দেরি হওয়ায় সে এমন জোরে টান মারল, যার ফলে মায়ের বাঁ কানের লতিটা সাংঘাতিকভাবে কেটে গেল।

৩৯২নং চক থেকে বিতাড়িত হয়ে যে রাস্তা ধরে সামনে পেলেন সেই রাস্তা বেয়ে চললেন। গরমের দিন তখন—সারাদিন লু-হাওয়া বইছে। পানি রাখবার জন্য একটা মাটির ভাঁড়ও ছিল না তাঁদের। কোথাও কোনো কুয়া দেখলেই মা তাঁর ওড়না ভিজিয়ে নিতেন, যাতে তৃষ্ণা পেলে ছোট ভাইদের চোষানো যায়। এভাবে চলতে-চলতে তাঁরা ৫০৭ নম্বর চকে পৌঁছলেন। সেখানে একজন চেনাশোনা বসতি স্থাপনকারী নানাজিকে কামলা রাখল। নানাজি হাল বাইতেন, নানি গরু-মোষ চরাতেন, মা ক্ষেত থেকে ঘাস আর চারা কেটে জমিদারের গরু-মোষের খাবার জোগাতেন, তখন তাঁদের এতটুকু সঙ্গতিও ছিল না যা দিয়ে পেটভরে একবেলার খাবার খেতে পারেন। কখনো বুনো ফল খেয়ে থাকতেন সবাই। কখনো খেতেন কুড়িয়ে পাওয়া তরমুজের খোসা। কখনো বা কারো ক্ষেতে পড়ে থাকা টক ফল কুড়িয়ে এনে তার চাটনি করা হত। একদিন কোত্থেকে যেন কলতা শাক পাওয়া গেল, নানা কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। মা চুলোয় শাক চাপিয়ে যখন একেবারে সিদ্ধ করে এনেছেন, এবার শাকটা নেড়ে-চেড়ে ঘাঁটতে হবে, সেই সময় হাতা দিয়ে নাড়তে গিয়ে হাঁড়িতে এত জোরে ঘা লাগল যে হাঁড়ির তলাটা গেল ভেঙে। সব শাক পড়ে গেল চুলোর মধ্যে। নানি এসে মাকে ধমকালেন এবং মারলেনও। সে-রাতে গোটা পরিবার চুলোর ভেতরে পোড়া কাঠে লেগে থাকা শাক কোনোমতে আঙুল দিয়ে চেটে-চেটে খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করল।

৫০৭ নম্বর চকে নানাজির ভাগ্য ফিরে গেল। কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রমের পর পুনর্বাসনের সূত্রে সাজে কিস্তিতে তিনিও একখণ্ড জমি পেয়ে গেলেন। আস্তে-আস্তে সুদিন আসতে লাগল এবং দু'তিন বছরের মধ্যেই নানাজি গ্রামের সচ্ছল লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেলেন। এমনি দিন-দিন যখন সচ্ছলতা বেড়ে চলল পিতৃভূমির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। সুতরাং সচ্ছলতার চার-পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সমস্ত পরিবার নিয়ে রেলে চড়ে মেনিলা রওনা হলেন। রেল-ভ্রমণে মা খুব আনন্দ পেলেন। সারা পথ তিনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকিয়েছিলেন; এর ফলে বেশ কিছু কয়লার গুঁড়ো তাঁর চোখে পড়ে। কয়েকদিন চোখের পীড়ায় ভুগতে হয় তাঁকে। এই অভিজ্ঞতার কারণে তিনি সারাজীবনে তাঁর ছেলেদের কোনোদিনই রেলগাড়ির জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে দেখবার অনুমতি দেননি। মা রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে সফর করতে পারলেই খুব সন্তুষ্ট থাকতেন। সহযাত্রিনী মেয়ে ও ছোট ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতেন খুব তাড়াতাড়ি। পথের ক্লান্তি আর ধুলোবালিতে তাঁর কোনো অসুবিধা হত না। প্রথম শ্রেণীতে বরং ভ্রমণেই তিনি কষ্ট পেতেন বেশি। দু'একবার যখন তাঁকে এয়ার-কন্ডিশন্ড গাড়িতে ভ্রমণে বাধ্য হতে হয়েছিল, তখন তিনি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলেন। মনে হয়েছিল সারাক্ষণ যেন জেলখানার কষ্ট ভোগ করছেন।

মেনিলায় পৌঁছে নানাজি তাঁর পরিত্যক্ত পৈতৃক বাড়ি ঠিকঠাক করলেন। আত্মীয়-স্বজনদের নানা উপহার দিলেন, দাওয়াত করে খাওয়ালেন সবাইকে। তারপর মায়ের জন্য বর খোঁজা শুরু করলেন।

সে-যুগে জমিওয়ালাদের প্রভূত সম্মান ছিল। ভাগ্যবান এবং সম্মানিত বলে পরিগণিত হতেন তারা। সুতরাং চারদিক থেকে মায়ের জন্য বিয়ের খবর আসতে লাগল। এমনিতেও মায়ের জাঁকজমক ছিল; তার ওপর বরপক্ষের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য নানি তাঁকে রোজ নতুন-নতুন কাপড় পরিয়ে নতুন বউ-এর মতো সাজিয়ে রাখতেন।

কখনো-কখনো মা স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বলতেন, 'সে-সময় তো আমার বাড়ি থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। যে-পথ দিয়ে আমি যেতাম সে পথের লোকজন আমাকে দেখে হতভম্ব হয়ে যেত এবং পরস্পর বলাবলি করত, "ঐ যে, খেয়াল বখ্‌শ জমিদারের মেয়ে যাচ্ছে। না জানি কোন ভাগ্যবান তাকে বিয়ে করবে।"

"মা, আপনার নজরে এমন কোনো ভাগ্যবান ছিল না?" আমরা কৌতূহলী হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম।

"আরে বাপ, তউবা, তউবা।" মা হাত দিয়ে কান ঢাকতেন, "আমার নজরে কেউ কী করে থাকবে! তবে হ্যাঁ, আমার অন্তরে এই সামান্য আশাটুকু ছিল যে, যেন আমি এমন কাউকে পাই, যে কিছুটা লেখাপড়া জানে—তা হলেই খোদার অপার অনুগ্রহ মনে করব।"

সারাজীবন এই একটি আকাঙ্ক্ষাই মায়ের মনে তাঁর নিজের জন্য রক্ষিত ছিল; সে আকাঙ্ক্ষা খোদা এমনভাবে পূর্ণ করলেন যে, সেই বছরেই আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে মায়ের বিয়ে হয়ে গেল।

সেকালে ওই অঞ্চলে আব্দুল্লাহ্ সাহেবের খুব নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান। কিন্তু পাঁচ-ছ বছর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হয়ে পড়েন। অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে পড়ে। বাপ মারা যাওয়ার পরই জানা গেল যে, তাঁর সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দেয়া আছে। সুতরাং আবদুল্লাহ সাহেব তাঁর মাকে নিয়ে একটা কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিলেন। ধন-সম্পদের এই পরিণতি দেখে তিনি এমন এক সম্পদ আহরণ করতে দৃঢ় সংকল্প হলেন, যা কোনো মহাজনের কাছে বন্ধক দেয়া সম্ভব নয়। তাই আবদুল্লাহ্ সাহেব মনপ্রাণ দিয়ে লেখাপড়া করতে লাগলেন। বৃত্তির পর বৃত্তি লাভ করে, দু বছরের পরীক্ষা এক বছরে পাস করে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম হলেন। সেকালে সম্ভবত এই প্রথমবার কোনো মুসলমান ছাত্র ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় রেকর্ড স্থাপন করে।

উড়তে-উড়তে এই খবর স্যার সৈয়দের কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি তখন আলিগড় কলেজ পত্তন করেছেন। তিনি তাঁর একজন বিশিষ্ট কর্মচারীকে গ্রামে পাঠালেন এবং আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে বৃত্তি দিয়ে নিয়ে এলেন আলিগড়ে। এখানে এসে আবদুল্লাহ্ সাহেব অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিএ পাস করে সেখানেই ইংরেজি, আরবি, দর্শন ও অঙ্কের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

স্যার সৈয়দের কামনা ছিল মুসলমান যুবকরা অধিকতর সংখ্যায় উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হোক। তাই তিনি আবদুল্লাহ্ সাহেবের জন্য বৃত্তি আদায় করে আইসিএস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত যাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

গত শতাব্দীর মুরুব্বিরা সাত সমুদ্দুর পারের যাত্রাকে খুব বিপজ্জনক মনে করতেন। সঙ্গত কারণে আবদুল্লাহ সাহেবের মা-ও তাঁকে নিষেধ করলেন বিলেত যেতে। আবদুল্লাহ্ সাহেবের ভাগ্য হল অপ্রসন্ন, তিনি বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করলেন।

এ-কথা শুনে স্যার সৈয়দের রাগ এবং দুঃখ হল। তিনি অনেক করে বোঝালেন, ভয় দেখালেন, ধমক দিলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ সাহেব 'না' থেকে 'হ্যাঁ'-তে এলেন না।

'তুমি কি জাতীয় স্বার্থের চেয়ে তোমার বুড়ি মা'র কথাকে বড় মনে কর।' স্যার সৈয়দ গর্জে উঠলেন।

'জী হ্যাঁ।' জবাব দিলেন আবদুল্লাহ সাহেব।

জবাব শুনে স্যার সৈয়দ রাগে আর সংযত রাখতে পারলেন না নিজেকে। কামরার দরজা বন্ধ করে প্রথমে তাকে চড় থাপ্পড় মারলেন। তারপর কলেজের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়ে বললেন, 'এখন তুমি এমন জায়গায় গিয়ে মর, যেখান থেকে আমি আর তোমার নামও যেন শুনতে না-পাই।'

আবদুল্লাহ্ সাহেব যেমন সুবোধ ছেলে ছিলেন, তেমনি ছাত্র হিসেবেও ছিলেন প্রতিভাবান। ম্যাপে তিনি সবচেয়ে দূরে গিলগিট শহর দেখতে পেলেন। সুতরাং, নাক বরাবর চলে গিয়ে সেখানে হাজির হলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে গভর্নর নিযুক্ত হলেন।

যে সময়ে মায়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, সে-সময়ে আবদুল্লাহ্ সাহেবও ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। অদৃষ্টের লেখন ছিল, তাই তাঁর সঙ্গেই বিয়ের বাগ্‌দান হয়ে গেল। এক মাস পর বিয়ের তারিখও ঠিক হল, যাতে আবদুল্লাহ সাহেব বউ নিয়ে গিল্‌গিট যেতে পারেন।

বাগদানের পর একদিন মা তাঁর সইদের সঙ্গে নিয়ে পাশের গাঁয়ে এক মেলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে কিংবা সম্ভবত জ্ঞাতসারে আবদুল্লাহ্ সাহেবও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মায়ের সইরা তাঁকে ঘিরে ধরল। সবাই তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে পাঁচ টাকা করে আদায় করল। আবদুল্লাহ্ সাহেব মাকেও অনেক টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি নিলেন না। যখন খুব অনুরোধ করা হল, তখন নিরুপায় হয়ে মা এগারো পয়সার ফরমাশ করলেন।

"এত বড় মেলায় এগারো পয়সা দিয়ে কী করবে?" আবদুল্লাহ্ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

"আগামী বৃহস্পতিবারে আপনার নামে মসজিদে তেল পাঠাব।" মা জবাব দিলেন।

জীবনের মেলায়ও আবদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে মায়ের লেনদেন মাত্র বৃহস্পতিবারের এগারো পয়সার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার চেয়ে বেশি পয়সা তিনি কোনোদিন চাননি এবং নিজের কাছে রাখেনওনি।

গিল্‌গিটে আবদুল্লাহ সাহেবের খুব শান-শওকত ছিল। সুন্দর সাজানো বাংলো, প্রশস্ত বাগান, চাকর-বাকর, দরজায় প্রহরী। যখন আবদুল্লাহ্ সাহেব বাইরে ট্যুরে যেতেন বা ফিরে আসতেন, তখন সাতটা তোপধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হত। এমনিতেও গিল্‌গিটের গভর্নর হিসেবে সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি কিন্তু মায়ের ওপর এসব ক্ষমতা ও গর্বের কণামাত্রও প্রভাব পড়েনি। কোনো প্রকারের ছোট-বড় পরিবেশও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না। বরং মায়ের সরলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রত্যেক পরিবেশকেই গাম্ভীর্যমণ্ডিত করে তুলত।

সে সময়ে স্যার ম্যালকন হ্যালি গিল্‌গিটের রুশ ও চীন সীমান্তের ব্রিটিশ পক্ষীয় পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। একদিন লেডি হ্যালি ও তাঁর কন্যা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের পরনে ফ্রক ছিল। হাঁটু থেকে গোড়ালি খোলা। এই নির্লজ্জতা মা পছন্দ করলেন না। তিনি রেডি হ্যালিকে বললেন, "তোমার জীবন তো যেভাবে হোক কেটেই গেছে। এখন মেয়েটার জীবনটা তার নষ্ট কর না।" এ-কথা বলে তিনি মিস্ হ্যালিকে তার কাছে রেখে দিলেন। তাকে রান্না, বাসন মাজা, কাপড় সেলাই করা সব শিখিয়ে তার বাপমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

যখন রুশ বিপ্লব শুরু হয়, তখন লর্ড কিসেজ গিল্‌গিট সীমান্ত পরিদর্শনে আগমন করেন। তাঁর সম্মানার্থে গভর্নরের পক্ষে থেকে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। মা নিজের হাতে দশ-বারো রকমের খাবার তৈরি করেন। অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার। খাওয়ার শেষে লর্ড কিসেজ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "মিস্টার গভর্নর, যে খানসামা এই খাবার রান্না করেছে অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার তরফ থেকে তাঁর হাত চুম্বন করুন।"

ভোজ শেষে আবদুল্লাহ্ সাহেব খুশি মনে বাড়ি ফিরে দেখলেন মা রান্নাঘরের এক কোণে একটা মাদুর পেতে বসে লবণ ও মরিচের চাটনি দিয়ে মকাই-এর রুটি খাচ্ছেন।

একজন গভর্নরের মতোই আবদুল্লাহ সাহেব মায়ের হাতে চুমু দিলেন এবং বললেন, "যদি লর্ড কিসেজ এই আদেশ দিতেন যে, তিনি স্বয়ং খানসামার হস্ত চুম্বন করবেন, তাহলে তুমি কী করতে?"

"আমি?" মা ভ্রুকুটি করে বললেন, "আমি তার গোঁফ হেচকা টানে ছিঁড়ে নিতাম। তারপর আপনি কী করতেন?"

"আমি?" আবদুল্লাহ সাহেব নাটকীয় ভঙিতে বললেন, "আমি সেই গোঁফ তুলো দিয়ে বেঁধে ভাইসরস-এর কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তারপর পালিয়ে যেতাম তোমাকে নিয়ে। যেমন করে পালিয়ে এসেছি স্যার সৈয়দের কাছ থেকে।"

মা এ-সব কথা গ্রাহ্যও করতেন না। কিন্তু একবার, শুধু একবার তিনিও হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরেছিলেন—যা মেয়েদের একমাত্র উত্তরাধিকার।

গিল্‌গিটের আইন সংক্রান্ত আদেশাবলিকে 'গভর্নরি' বলা হতো। এ-কথা যখন মায়ের কানে গেল, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ সাহেবকে অভিযোগ করলেন :

"রাজত্ব তো করছেন আপনি; কিন্তু লোকে 'গভর্নরি', 'গভর্নরি' বলে আমাকে খামোখা মাঝখানে টানাটানি করে কেন?"

আবদুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন আলিগড়ের ছাত্র। রসিকতা করবার জন্য মেতে উঠলেন তিনি। সরস কণ্ঠে বললেন : "ভাগ্যবতী, এ গভর্নরি তোমার নাম নয়। গভর্নরি হল তোমার সতীনের নাম—যে সব সময় আমার পেছনে ধাওয়া করছে।"

রসিকতার চূড়ান্ত। আবদুল্লাহ্ সাহেব বুঝলেন, কথার সমাপ্তি হয়ে গেল এখানেই। কিন্তু মায়ের মনে দুঃখ দানা বেঁধে গেল। তিনি কথাটা নিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

কিছুদিন পর কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিং মহারানীকে সঙ্গে নিয়ে গিল্‌গিট বেড়াতে এলেন। মা তাঁর মনের ব্যথা মহারানীকে শোনালেন। মহারানীও ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। তিনি উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন : "হায়-হায়, আমার রাজ্যে এই অত্যাচার? আমি আজই মহারাজাকে বলব, তিনি আবদুল্লাহ্ সাহেবকে দেখে নেবেন।"

ব্যাপারটা যখন মহারাজার কানে গেল, তিনি আবদুল্লাহ সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আবদুল্লাহ্ সাহেবও স্তম্ভিত হয়ে ভাবলেন এ কী বিপদ। কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে যখন আরো খোঁজ নেয়া হল, তখন উভয়েই খুব করে হাসলেন। দু'জনেই বুদ্ধিমান। সুতরাং মহারাজা আদেশ দিলেন যে, এবার থেকে গিল্‌গিটের গভর্নরপত্নীকে ভবিষ্যতে ওজারত ও গভর্নরকে উজিরে ওজারত বলে সম্বোধন করা হবে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত গিল্‌গিটে এই সরকারি নির্দেশই প্রচলিত ছিল।

এই হুকুমনামা শুনে মহারানী মাকে ডেকে সুসংবাদ দিলেন যে, মহারাজ 'গভর্নরি'কে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন।

মহারানীর কোনো সন্তান ছিল না। এজন্যে প্রায়ই তিনি মাকে দোয়া করতে বলতেন। মা নিজে অবশ্য বলতেন তাঁর মতো সৌভাগ্যশালী মা পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু ধৈর্য, তুষ্টি এবং সব কিছু মেনে নেয়ার, সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা, চশমাজোড়া খুলে ফেলে যদি দেখা যেত তা হলে সেই সৌভাগ্যের পর্দার অন্তরালে কত দুঃখ, কত বিষাদ এবং কত আঘাত যে লুকানো ছিল তা প্রকট হয়ে ধরা পড়ত।

আল্লাহ্‌তালা মাকে তিনটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে দান করেন। দুই মেয়ে বিয়ের কিছুকাল পরে একে-একে মারা যায়। বড় ছেলেও যৌবনের প্রারম্ভে বিলেতে গিয়ে মারা যায়।

মুখে অবশ্য বলতেন যে, আল্লাহ্‌র মাল, আল্লাহ্ নিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি কি একা-একা কোনো সময়ই লুকিয়ে তাদের কথা মনে করে অশ্রুপাত করতেন না? যখন আবদুল্লাহ্ সাহেব ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল বাষট্টি বছর ও মায়ের বয়স পঞ্চান্ন বছর। আবদুল্লাহ্ সাহেব দড়ির খাটে রোজকার মতো বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মা পায়ের কাছে বসে চাকু দিয়ে আখ কেটে-কেটে তাঁকে দিচ্ছিলেন। তখন বিকেল। আবদুল্লাহ্ সাহেব মজা করে আখ চুষছিলেন আর মেতে ছিলেন হাসি-তামাশায়। তারপর অকস্মাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে মাকে বললেন, "হায় আল্লা, বিয়ের আগে মেলায় তুমি যে আমার কাছ থেকে এগারো পয়সা নিয়েছিলে, তা কি শোধ দেয়ার সময় এখনও হয়নি?"

মা নববধূর মতো মাথা নামিয়ে আখ কাটতে লাগলেন। তাঁর বুকে একসঙ্গে অনেক কথা গুমরে উঠল।

"সময় এখনো হল কোথায় প্রিয়? বিয়ের আগের এগোরো পয়সার ঋণ তো বইছিই। কিন্তু বিয়ের পরে যেমন করে তুমি আমাকে আদর-যত্ন করেছ সেজন্য তোমার পা ধুয়ে পানি খেতে হয়। আমার গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে তোমাকে পরানো উচিত আমার। এখনই কি শোধ করবার সেই সময় এসেছে!"

কিন্তু আজরাইলের খাতায় সময় এসে পড়েছিল। মা যখন মাথা তুললেন, তখন আবদুল্লাহ্ সাহেব আখের টুকরো মুখে নিয়ে পাশবালিশের উপর ঢলে পড়েছেন। মা তাঁকে ডাকলেন, নাড়া দিলেন, সুড়সুড়ি দিলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ সাহেব এমন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তা থেকে জাগানো কিয়ামতের আগে কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

মা তাঁর অবশিষ্ট দুই ছেলে ও এক মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন : "বাছারা, কেঁদো না—তোমাদের আব্বা যেমন শান্তিতে এই দুনিয়ায় বাস করতেন, তেমনি শান্তিতেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। কেঁদো না, কাঁদলে তাঁর আত্মা কষ্ট পাবে।"

মুখে তো মা বললেন, তোমাদের আব্বার কথা মনে করে কেঁদো না, তাহলে তাঁর কষ্ট হবে। কিন্তু তিনি কি তাঁর স্বামীর কথা স্মরণ করে বাকি জীবনে একটুও কাঁদেননি?

যখন তিনি নিজেও বিদায় নিলেন, তখন তাঁর সন্তানদের মনে এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

যদি মায়ের নামে কিছু দান করতে যাই, তাহলে এগারো পয়সার বেশি দিতে সাহস হয় না, অথচ মসজিদের মোল্লা তো বিস্মিত হয়ে বলেন যে, বিজলির রেট বেড়ে যাচ্ছে—তেলের দামও বাড়ছে।

মায়ের নামে যদি ফাতেহা দিতে চাই, তাহলে মকাই-এর রুটি আর লবণ-মরিচের চাটনির কথা মনে পড়ে। যাকে খাওয়াই সে বলে ফাতেহা দরুদে তো পোলাও-জরদা হওয়াই উচিত।

মায়ের কথা মনে এলেই বাঁধ ভেঙে কান্না আসে। কিন্তু যদি কাঁদি তাহলে ভয় হয়, পাছে মায়ের রুহের কষ্ট হয়, আর যদি কান্না দমন করতে যাই—খোদার কসম, কান্না থামানো যায় না।

লেখক পরিচিতি

প্রেমচন্দ

হিন্দি ও উর্দু কথাসাহিত্যে প্রেমচন্দ-এর অবস্থান অনেকটা বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই পথিকৃতের। এক ঋষিকল্প নির্মোহে তিনি সমাজের অন্ত্যজ মানুষের গাথা রচনা করে গেছেন তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। ৫৬ বছরের (১৮৮০-১৯৩৬) সংক্ষিপ্ত জীবনে এই লেখক প্রায় ষোলটি উপন্যাস এবং আড়াইশ'র মতো ছোটগল্প ছাড়াও নাটক, প্রবন্ধ, ইত্যাদি লিখে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'সেবাসদন', 'প্রেমাশ্রম', 'গবন', 'গোদান' এবং ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে 'কফন', 'সদগতি', 'পৌষের রাত', 'গুলিডাণ্ডা', 'পরীক্ষা', 'বড় ঘরের মেয়ে' ইত্যাদি। তাঁর আসল নাম ধনপত রায় কিন্তু ইংরেজ রাজরোষ এড়াবার জন্য প্রেমচন্দ ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের দিকপাল হিসেবে তিনি এই নামেই এখন পরিচিত।

কৃষণ চন্দর

উর্দুসাহিত্যে কৃষণ চন্দর (১৯১৫-১৯৭৭) অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন লেখক। তাঁর লেখা ছোটগল্প সংকলন, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য সব মিলিয়ে গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশ'। স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন 'নেহরু স্মৃতি পুরস্কার' এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধি। জটিলতাহীন সহজ আটপৌরে ভাষায় লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাস সহজেই পাঠককে প্রভাবিত করে। বাষট্টি বছর বয়সে কৃষণ চন্দর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সেরা উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'গাদ্দার', 'আমি গাধা বলছি', 'যবখেত জাগে', 'পরাজয়', 'অন্নদাতা' এবং ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস', 'জামগাছ', 'জঞ্জাল বুড়ো', 'ভরা চাঁদের রাত', 'চৌরাস্তার কুয়া' ইত্যাদি।

রাজেন্দ্র সিংহ বেদী

উর্দু কথাসাহিত্যে রাজেন্দ্র সিংহ বেদীর অবস্থান একটি ভিন্নমাত্রায়। তিনি গল্পে সমকাল প্রভাবিত সামাজিক সভ্যতা এবং সমাজের ব্যক্তিমানুষের মানসিক টানাপড়েন নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। ফলে সাধারণ মানুষ তার সার্বিক পরিস্থিতির ভেতর থেকে নিজস্ব ইচ্ছা, ব্যর্থতা, দক্ষতা ও অক্ষমতা সমেত বেদীর গল্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—আমরা চরিত্রটির ভেতরের এবং বাইরের সবটুকু রূপ দেখতে পাই। গল্পে এই কাজগুলো

করতে গিয়ে তিনি উর্দু অন্যান্য লেখকদের মতো ভাষার জনপ্রিয় রূপটি একেবারে এড়িয়ে গেছেন—যে কারণে তার পাঠকপ্রিয়তাও অন্যদের তুলনায় কিছুটা কম। 'মিথুন', 'তোমার দুঃখ আমাকে দাও', 'বব্বক', প্রভৃতি গল্পগুলো তার সেরা কাজের অন্যতম।

ইসমত চুগতাই

ইসমত চুগতাই উর্দুসাহিত্যে ব্যাপক পরিচিত একটি নাম। সমাজে বিভিন্নশ্রেণীর নারীকে নিয়ে তিনি প্রচুর গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। নারীজীবনের সামাজিক জটিলতাগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে গিয়ে ইসমত চুগতাই সমালোচকের দৃষ্টিতে বারংবার বিতর্কিতও হয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত গল্পের মধ্যে রয়েছে 'দুই হাত', 'অমর লতা', 'একটি সামান্য কথা' ইত্যাদি।

সাদত হাসান মান্টো

অত্যন্ত জনপ্রিয় এই লেখক চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে (১৯১২-১৯৫৫) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সিংহভাগ গল্প-উপন্যাসের চরিত্র হচ্ছে সমাজের বিকারগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ ও যৌন-বিকৃত মানুষ। একরকম বোম্বের চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেন। সব মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশের মতো। মান্টোর সেরা গল্পের মধ্যে ধরা হয় 'ঠাণ্ডা গোশত', 'খুলে দাও', 'গন্ধ' ইত্যাদি। 'বিশ্বের সকল যন্ত্রণার জননী হচ্ছে ক্ষুধা' উর্দুসাহিত্যে ব্যাপক পরিচিত উক্তিটির লেখক মান্টো সাহিত্যে অশ্লীলতার দায়ে বেশ কয়েকবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হন।

খাজা আহমদ আব্বাস

খাজা আহমদ আব্বাস (১৯১৪) উর্দুসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠকপ্রিয় লেখক। গল্পের সংখ্যা তাঁর প্রায় শতাধিক। উপন্যাস আছে সাতটির মতো। চলচ্চিত্রের কাহিনী, সংলাপ রচনা, চিত্র পরিচালনা ও চিত্র প্রযোজনার কাজ করেছেন একসময়। তাঁর কয়েকটি ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। তাঁর লেখার ভঙ্গি সহজ সরল। 'প্রতিশোধ', 'সর্দারজি', 'চড়ুই পাখি' ইত্যাদি গল্পগুলো তার লেখকশৈলীর পরিচয় বহন করে।

কুদরতুল্লাহ শাহাব

কুদরতুল্লাহ শাহাব উর্দুসাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক হলেও তার লেখার সংখ্যা খুবই কম। তাঁর রচনায় আজগুবি কল্পনাবিলাস কিংবা দুর্বোধ্যতা কিছুই নেই। চরিত্র আঁকেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে। বাংলা ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে খুবই কম। 'রেলওয়ে জংশন', 'অনাথ আশ্রম', 'মা', 'লালফিতা', গল্পগুলো পাঠকসমাজে বেশ আদৃত।

অনুবাদক

সদগতি ॥ ননীগোপাল শূর
জঞ্জাল-বুড়ো ॥ ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
মিথুন ॥ ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
দুই হাত ॥ ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্দারজি ॥ এ বি এম কামাল উদ্দিন শামীম
প্রতিশোধ ॥ অজ্ঞাত
মা ॥ শহিদুল আলম

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি '**চিরায়ত গ্রন্থমালা**'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র